অদৃশ্য মানুষ

(কথাচিত্রে রূপায়িত)

প্রবোধ সরকার

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

দাম :

তিন টাকা

প্রচ্ছদ :

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :

শ্রীতীর্থনাথ পাল

নবজীবন প্রেস

৬৬ গ্রে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

প্রকাশক :

শ্রীঅশোককুমার প্রামাণিক

১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড

কলিকাতা-৬

আমার কথা

চিত্র-পরিচালক বন্ধুবর অমরদত্তের সঙ্গে চিত্র-উপযোগী গল্প আলোচনা প্রসঙ্গে 'অদৃশ্য মানুষের' উৎপত্তি চায়ের টেবিলে। 'অদৃশ্য-মানুষ' H. G. wellsএর Invisible Manএর অনুবাদ নয়, তার 'ছায়া' কোন জায়গায় নেই তবে কয়েকটি জায়গায় স্বেচ্ছাকৃত 'ছাপ' আছে। এই ঋণের জন্য আমি লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ। তাছাড়া গল্পটি সম্পূর্ণ এদেশীয় ছাঁচে ঢালা।

আজ পর্য্যন্ত আমার যে ক'খানি বই ছায়াচিত্রে রূপায়িত হ'য়েছে—একমাত্র 'গোপাল ভাঁড়' বাদে আর কোনখানিও হাসির গল্প নয়। কাজেই সুধী দর্শক ও পাঠকসমাজ যদি 'অদৃশ্য মানুষ'কে সুনজরে দেখেন তবেই......

উলুবেড়িয়া, হাওড়া।
১৯৫৩
বড়দিন

প্রবোধ সরকার

রায় বাহাদুর

শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি

আই. পি. এস., জে. পি., এ. আর. পি. এস. (লণ্ডন)

পল্লীগ্রাম। তবে অজ পাড়াগাঁ বলতে যা বোঝায়—তা নয়। ক'লকাতা থেকে মাত্র মাইল কয়েক দূরে। ট্রাম নেই তবে ট্যাক্সি আছে। এছাড়া পাওয়া যায় সাইকেল রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী। এছাড়া আছে হাট, বাজার, স্কুল, কলেজ (ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত), দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালত। তবু আধুনিক সহর নয়। কারণ আশপাশে চোখের সামনে দেখা যাবে—ধানক্ষেত, পুকুর, এঁদোপড়া ডোবা, জঙ্গলভর্ত্তি ডাব-নারকেল-আম বাগান, পড়ো জমি। কাজেই এটা পল্লীগ্রাম—বেশ বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীগ্রাম। এখানে পায়ে চলার বাঁকা রাস্তাও চোখে পড়ে আবার খোয়ার ওপর পিচ্‌ঢালা রাস্তারও অভাব নেই। সম্প্রতি বিদ্যুৎও চালু করা হয়েছে। রেল ষ্টেশন মাত্র মিনিট দশেকের পথ।

এহেন পল্লীগ্রামে একটা বাঙলো প্যাটার্নের বাড়ীর সামনে গল্পের যবনিকা উঠলো। প্রায় বছর দশেক হলো এই বাড়ীটার ভাড়াটে হিসেবে বাস করে আসছেন বৈজ্ঞানিক সমরবাবু। এখানে একটি লেবরেটরী করে তিনি দিনের পর দিন গবেষণা করে চলেছেন। সংসারে আছে একটি বিশ্বস্ত সেবায়েৎ—নাম দেবু। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—অর্থাৎ ঐ দুটো কাজ বাদ দিয়ে সব কাজই দেবুকে করতে হয়। সংসারের সে-ই গৃহিণী আর সে-ই কর্ত্তা। সমরবাবু শুধু টাকা দিয়েই খালাস। আর আছে একটি পোষ্য—নাম ভানু, সম্পর্কে ভাগনে। সমরবাবু ভানুকে খুবই ভালবাসেন—ঠিক নিজের ছেলের মত। ভানু এবছর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে।

টাকার অভাবে ক'মাস বাড়ী ভাড়া বাকি পড়েছে। সমরবাবু তাঁর গবেষণা নিয়েই মসগুল, দেবুর কথা এক কান দিয়ে শোনেন আর অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। ভাড়ার তাগাদার জ্বালায় সে অস্থির হ'য়ে উঠেছে। কবে বলতে কবে আবার যে এসে ঝামেলা সুরু করবে বাড়ীওলা নবদ্বীপবাবু— তা কে জানে। এবার তাকে ধাপ্পা দিয়ে ফেরান কিন্তু মুস্কিল।

রণরণে দুপুর। তখনও কারোর খাওয়া হয় নি। সমরবাবুর তো স্নান, আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় বলে কিছু নেই। ভানু গেছে টহল দিতে—পরীক্ষার পর ছেলেরা যা করে থাকে। কখন ফিরে স্নান আহার করবে কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। রান্নার কাজ সেরে দেবু বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে দরজার ধারে রকের ওপর বসে একটা বিড়ি ধরালে। এহেন সময় নবদ্বীপবাবু কন্যা মণ্টুরাণীকে নিয়ে এসে হাজির। মণ্টুরাণীর সাজগোজ দেখে মনে হয়—তারা বাপ-বেটীতে আজ এখানে নিমন্ত্রণ খেতে এসেছে। যতদূর মনে পড়ে— নিমন্ত্রণ আজ তাদের ছিল না।

ধাতস্থ হ'তে বেশী সময় লাগলো না দেবুর।

—বলি—আজ অশ্লেষা—কাল মঘা—পরশু বাবুর জন্মোবার। এমনি ভাবে ধাপ্পার পর ধাপ্পা,—ওজর আপত্তির পর ওজর আপত্তি তো চলেই আসছে। আর কতদিন এভাবে কাটাবে, মাণিক! তিন-তিনমাসের বাড়ী ভাড়া বাকি, লেয়াও রুপেয়া। বলে হাতের লাঠিটা ঠুকে রকের ওপর বসলো নবদ্বীপবাবু। পাশের অপরিসর জায়গাটুকু দেখিয়ে বললে—বসো মা পুঁটুরাণী।

—মাইরি নবদ্বীপদা। এবার টাকার জন্যে আর তোমার ঘুরতে হবে না। এতোদিন সবুর করলে—আর কটাদিন চোখ কান বুজিয়ে থাকো, নগদ টাকা হাতে হাতে পেয়ে যাবে।

পুঁটুরাণী ন্যাকা ন্যাকা গলায় বললে, দেবুদা তোমার সঙ্গে ঠাট্টা কচ্ছে বাবা।

কোটরে ঢোকা চোখ দুটো পিট্‌ পিট্‌ করে নবদ্বীপবাবু বললে, বটে! মস্করা—মস্করা হচ্ছে আমার সঙ্গে। ওসব ধাপ্পায় আর ভবি ভুলছে না। আবি লেয়াও রুপেয়া।

—ঐ রূপেয়ার কথাই তো বলছি। আমার বাবু এবার এমন জিনিষ আবিষ্কার করতে চেষ্টা কচ্ছেন—যা এই সারা দুনিয়ার লোক কোনদিন কল্পনাও করেনি। ব'লে দেবু বিজ্ঞের হাসি হাসলে।

চাপা গলায় নবদ্বীপবাবু বললে, কি সব্বোনাশ! নোট জালের কোন আহা মরি ফন্দি ফিকির বার কচ্ছে নাকি?

—আরে—না—না। আবিষ্কার—আবিষ্কার!

এমন অদ্ভুত কথা নবদ্বীপবাবু তার জীবনে কোনদিন শোনেনি। আবিষ্কার! সে আবার কি জিনিষ? অথচ 'আবিষ্কার' কথাটার মানে সামান্য একটা চাকরের কাছে জিজ্ঞাসা করতেও কেমন সরমে বাধে! গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে একটা ঢোক গিলে নবদ্বীপবাবু বললে, আবিষ্কার?

উত্তরে দেবু বললে আবার ঐ ছোট্ট কথাটি, হ্যাঁ—আবিষ্কার।

মাটি করলে পুঁটুরাণী; পরিষ্কার গলায় বাবাকে জিজ্ঞাসা করে বসলো, আবিষ্কার মানে কি বাবা? অনেক টাকা? তোমরা বুঝি অনেক টাকা পাবে, দেবুদা?

আবিষ্কারেব মানের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে দেবু।

—টাকা ব'লে টাকা! প্রচুর—প্রচুর টাকা আসবে।

ন্যাকা ন্যাকা গলায় পুঁটুরাণী প্রশ্ন করলে, টাকা কোথা থেকে আসবে, দেবুদা?

—আসমান ফুঁড়ে আসবে। তখন তোমাদের বাড়ীভাড়া তো বাড়ীভাড়া—ইচ্ছে করলে, নগদ করকরে কাঁচা টাকায় তোমাদের বাড়ীটা আমরা কিনেও নিতে পারি।

নবদ্বীপবাবু আকাশ থেকে পড়লো। প্রায় আঁতকে উঠে বললে, এঁ্যা—বল কি? এ যে একবারে আবু হোসেনী কাণ্ডকারখানা গো! তা ওসব ঝঞ্ঝাটে কাজ কি বাপু। তোমার দাদাবাবুর সঙ্গে আমার এই পুঁটুরাণীর বিয়েটা দিয়ে দাও। ব্যস্—সব ল্যাটা চুকে যাক্

—সেটা অবশ্য মন্দ কথা বলনি, নবদ্বীপদা। গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকবে আর পিতৃপুরুষের তর্পণ হবে! বলিহারী মাথা তোমার দাদা! আচ্ছা—এখন তাহলে এসো দাদা!

মেয়েটাকে তোমার বাবুকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাব। এখন বেশ ডাগোরটি তো হ'য়েছে—বিয়ের আর দেরি করা ঠিক নয়। চল—ভেতরে চল। ব'লে পুঁটুরাণীর হাত ধরে উঠে দাড়াল নবদ্বীপবাবু।

নবদ্বীপবাবুর দু'কাঁধে ভর দিয়ে বসিয়ে দিলে দেবু। বললে, খবরদার। ও কাজটি করোনা দাদা! বাবু এখন ক্ষেপে আছে, সামনে যাওয়া ঠিক নয়।

—কেন—কেন—কেন—কেন ?

—ঐ যে বললুম—আবিষ্কার !

সখেদে পুঁটুরাণী বললে, আমার তবে সাজগোজই বুঝি সার হলো !

—সার হবে কেন—তুমি তোমার ভানুদার সঙ্গে দেখা করে এসো।

—দাদাবাবু তো বাড়ী নেই।

—ভানুদাও নেই ! পুঁটুরাণীর প্রায় কাঁদবার অবস্থা।

নবদ্বীপবাবু বললে, তুমিই তাহলে আমার হ'য়ে তোমার বাবুর কাছে কথাটা পেড়ে ফ্যালো।

—তাতো ফেলবো, কিন্তু পড়াশোনা শেষ না করে কেউ কখন কি বিয়ে করে! বিয়ে ক'রে বৌকে খাওয়াবে কি ?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নবদ্বীপবাবু বললে, আরে খাওয়াবো তো আমি। ভানু হবে ঘরজামাই। আমার এই সবেধন নীলমণি—শিবরাত্রির সলতে—একটি মাত্র মেয়ে পুঁটু ! তাকে কি আমি কাছ ছাড়া করতে পারি !

—কিন্তু পড়াশোনা শেষ না হলে—

দেবুকে শেষ করতে না দিয়ে নবদ্বীপবাবু হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন, ওর আর কথাটা কি! পড়াশোনা ছেড়ে দিলেই তো শেষ হ'য়ে গেল। বেশী পড়েই বা হবেটা কি! তার চেয়ে আমার ভুষি-মালের কারবারটা দেখুক—নগদ দু'পয়সা আসবে। নবদ্বীপচন্দের পুরো রাজত্ব আর এই রাজকন্যে যদি চাও তো ঝটপট্ তোমার বাবু আর দাদাবাবুকে রাজি করিয়ে ফ্যালো। কি বলিস মা পুঁটুরাণী ?

হেঁ হেঁ হেঁ ক'রে পুঁটুরাণী হেসে একবারে গড়িয়ে পড়লো।

বৈজ্ঞানিক সমরবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—দেবু! দেবু!

—আচ্ছা তোমরা তাহলে এখন এসো। বলে দেবু বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

পুঁটুরাণী বললে, না হলো ভাড়া আদায় আর না হলো পাকা-পাকি কোন কথা। এই জন্যে আসতে চাইনি!

আবার সেই বিশ্রী হাসি হেসে নবদ্বীপ বাবু বললে, দুঃখু করিসনি মা— আমি তোকে স্বয়ম্বরা ক'রে তবে ছাড়বো।

—স্বয়ম্বরা কাকে বলে বাবা?

—তবেই তো মুস্কিলে ফেললি। আচ্ছা আয়—পথে যেতে যেতে ব্যাখ্যা করে বলি। ব'লে মেয়ের হাত ধরে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে নবদ্বীপবাবু বাড়ীর পথে এগিয়ে চললেন।

চলতে চলতে আর বকতে বকতে সকন্যা নবদ্বীপবাবু পিচের রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় এসে পড়লেন। রাস্তার বাঁ দিকে একটা সান-বাঁধনো ঘাট আর ডান দিকে একটা আম কাঁটালের বাগান। সান-বাঁধানো ঘাটের নীচের ধাপে বসে শ্রীধর পণ্ডিত (ভানু পাঠশালে এঁর কাছে হাতেখড়ি দিয়েছিল) ছিপ ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করছেন। একমনে ফাতনার দিকে চেয়ে চেয়ে ঘাড়টা ঈষৎ নুয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি কমে আসার জন্যই মন সংযোগটা একটু বেশী দরকার হ'য়েছে। এহেন মাহেন্দ্র সুযোগ হেলায় হারাতে রাজি নয় ভানু। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিলে কি হবে—ছেলেমানুষ, দুষ্টু মিটা এখনও ছাড়তে পারেনি। পণ্ডিত মশাইয়ের টিকি কাটবার জন্য একখানি ধারালো কাঁচি কোথা থেকে যোগাড় করে নিয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে ঘাটের ধাপ বেয়ে নীচে নামছে। উদ্দেশ্য অতি মহৎ—এক হাতে টিকিটি ধরবে আর অন্য হাতে কাঁচি চালিয়ে টিকিটি কুচ করে কেটে নিয়ে মারবে ভোঁ-দৌড়। সেই কাটা টিকি দেখিয়ে বন্ধু মহলে মারবে টেক্কা—নেবে বাহাদুরী। ভাবটা এই—'তোরা কেউ পাস্তিস'।

কিন্তু ভানুর সকল আশায় ছাই পড়লো, পণ্ডিতের ফুল-বাঁধা টিকিটাও

[illegible] গুণে সে যাত্রা বেঁচে গেল। টোক আর কাটতে খুব বেশী ব্যবধান নেই—এ হেন সময় ডাক এলো, এই যে বাবাজী—!

কাচিটা টুপ করে পুকুরে ফেলে দিয়ে ভানু পিছন ফিরে দেখলে—ঘাটের পাশে রাস্তার ওপর সকন্যা নবদ্বীপবাবু।

—ভানুদা ওখানে কি কচ্ছিলে? একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলে পুঁটুরাণী।

ভানু মনে মনে বললে—'তোমাদের সগোষ্ঠির শ্রাদ্ধ' আর ধার করা হাসি টেনে এনে প্রকাশ্যে বললে, পণ্ডিত মশাইয়ের মাছ ধরা দেখছিলুম।

কথা বলতে বলতে ভানু ওপরে উঠে এলো। পণ্ডিত মশাই একবার ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দেখে আবার ফাতনায় মন দিলেন। এদের ওপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করলেন না।

—তুমি কি করছিলে—আমি দেখে ফেলেছি! মাথা দুলিয়ে মুখের দু'পাটি কোদালে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললে পুঁটুরাণী।

সারা অঙ্গ রী রী ক'রে উঠলো ভানুর। ইচ্ছে হলো—মারে গালে ঠাস করে একটা চড়। কিন্তু স্থান, কাল আর পাত্রী অনুরূপ না হওয়ায় সে নিজেকে সংযত ক'রলে। পুঁটুরাণীর কথাটা শুনেও না শোনার ভাণে প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করে বললে, তারপর—? খবর কি সব?

নবদ্বীপবাবু এমন নারীসুলভ সলাজ হাসি হাসলেন—যেন কথাটা বলতে তার মুখে বাধছে। বাপের হয়ে মেয়েই উত্তর দিলে, তোমাদের বাড়ীই গেসলাম।

ভানু মনে মনে বললে, কেন—মরতে। প্রকাশ্যে ঈষৎ রসিকতার সুরে বললে, ভাড়ার তাগাদায়?

পুঁটুরাণী ন্যাকা সুরে ঘাড়টা নীচু করে বললে, বাঃ রে তা কেন হবে। গেসলাম—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাটা পাকাপাকি করতে।

চোখ দুটো বড় বড় করে ভানু বললে, বল কি! তা কাঁচা-কাচিটা হলো কবে?

আবার সেই হাড়জ্বালানো ন্যাকামির ন্যাকা সুর,—যাঃ কি যে বল!

—হেঁ হেঁ—কথাটা আমার পুঁটুরাণী ঠিকই বলেছে, তবে ছেলেমানুষ কি না তাই গুছিয়ে বলতে একটু বাধলো। যাক্‌গে—, তাহলে বাবাজী—

—বাবাজী। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ভানু একবার বাপের আর একবার মেয়ের দিকে চাইলে।

— হবু জামাইকে লোকে বাবাজীই বলে থাকে! কেমন— তাই নয় মা, পুঁটুরাণী? আমি মুক্ষু-সুক্ষু লোক হলে কি হবে—মা সরস্বতী ভাবাজ্ঞান দিয়েছে চারপো টনটনে! নিজের খেয়ালে অর্থহীন হাসি হাসলে নবদ্বীপবাবু।

- দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা'দুটো তো আমার টনটনিয়ে গেল। এখন আসল বক্তব্যটা আপনার উগরে ফেলুন!

— বক্তব্য! বক্তব্য বিশেষ কিছু নয়। পুঁটুরাণীর সঙ্গে তোমার বিয়েটা—, বল না পুঁটু!

-- বাঃ রে লজ্জা করে না বুঝি!

এক গাল হেসে নবদ্বীপবাবু বললে,—হেঁ—হেঁ—তাতো করবেই— তাতো করবেই! তাহলে বাবাজী—অনেক দিনের ভাব ভালবাসা তোমাদের—

-- আঃ কি সব যা তা বলছো!

- এ্যাঁ! যা তা বলছি! ও হোঃ হোঃ— কিছু না—এ—কিছু না! তুমি তো বাবাজী রাজি—, এইবার চট্‌পট্ তোমার মামাবাবুকে রাজি করিয়ে ফ্যালো!

—সে কথা আর বলতে! সরে পড়বার তাল কচ্ছে ভানু।

দূর থেকে ভানুকে দেখে তার সহপাঠীরা চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে। বোধ হয় পরীক্ষার কোন খবর পেয়েছে। ভানু ছুটলো বাগান ঝাঁপিয়ে।

ছেলের দলকে কাছাকাছি আসতে দেখে নবদ্বীপবাবুর আতঙ্ক উপস্থিত হলো। নিভে গেল মুখের হাসি। ঈষৎ চাপা গলায় বললে, আয় মা পুঁটুরাণী চট্‌-পট্ আমায় কাছাকাছি দেখতে পেলেই ব্যাটারা বক্ দেখায়।

—কেন বাবা—বক্ দেখায় কেন

সে কথার উত্তর কিছু দিলে কি না বোঝা গেল না, শুধু পা চালিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতে দেখা গেল।

* * * *

বৈজ্ঞানিক সমরবাবুর গবেষণাগার। সামনে একটা লম্বা টেবিল। গবেষকের প্রয়োজনমত সমস্ত কিছু সাজসরঞ্জামই এলোমেলো ভাবে টেবিলের ওপর ছড়ানো। বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিষ হচ্ছে—ছোট্ট খাঁচার মধ্যে এক জোড়া খরগোস। খাঁচার পাশে একটি ছোট্ট পাত্রে খানিকটা তরল পদার্থ।

সমরবাবু কিছুতেই আর খরগোস দুটোকে আয়ত্বে আনতে পাচ্ছেন না। ওদিকে দেবুকে ডেকেও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অতিষ্ঠ হয়ে আপন-ভোলা সমরবাবু চীৎকারের পর চীৎকার করে দেবুকে ডাকছেন।

—দেবু! ওরে বেটাচ্ছেলে দেবু!

—দেবু মরেছে। দেবু না এসে দেবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

—এ্যাঁ—কখন? চোখ তুলে বৈজ্ঞানিক দেখলেন—দেবু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—ধ্যেৎ—এই তো দেবু! বলে খাঁচাটা দেবুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

—শুধু শুধু চেঁচাচ্ছেন কেন?

—ব্যাটার স্পর্দ্ধা কম নয়। শুধু শুধু—এ্যাঁ, আমি শুধু শুধু চেঁচাই। ধর—ধর ব্যাটা শক্ত করে একটা খরগোস। ধরে এই ওষুধটা খাইয়ে দে। বলে সমরবাবু ওষুধের পাত্রটা দেবুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

—শুধু শুধু একটা জীবকে কষ্ট দিয়ে কি হবে?

—শুধু শুধু—সব আমি কচ্ছি শুধু শুধু। দেখবি কেমন মজা হবে। বলে সমরবাবু ছোট ছেলের মত খিল খিল করে হেসে উঠলেন।

—দেবু যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়েই রইলো।

—ওরে বোকা—এই ওষুধটা খাইয়ে ওটাকে ভ্যানিস করে দিতে হবে। যাকে বাংলায় বলে উধাও।

—গম্ভীর মুখে দেবু অভিভাবকোচিত গাম্ভীর্য্যে বললে, আজকে তাহলে নাওয়া খাওয়া হবে না!

—এটাকে উধাও করে দিয়ে নাইতে খেতে যাবো।

—একটা কেষ্টোর জীবকে শুধু শুধু উধাও করে হবেটা কি?

এ ধরণের কথা কাটাকাটি আর কতক্ষণ ভাল লাগে। দেবু ব'লে তাই রেহাই পেয়ে যাচ্ছে—অন্য কেউ হলে এতক্ষণ কি আর রক্ষা ছিল! বিরক্তিভরা কণ্ঠে সমরবাবু বললেন, হবে আমার মাথা আর তোর মুণ্ড। ওরে ব্যাটা হবুচন্দ্র! এটা উধাও করে হবে অসাধ্য সাধন—অসাধ্য সাধন!

—পয়সা কড়িই যদি না এলো তো অসাধ্য সাধন করে হবেটা কি? বাড়ীভাড়া—সংসার খরচা—দাদাবাবুর কলেজের মাইনে—

—ওটা যেমন করে হোক—জোগাতেই হবে। পড়ার খরচা না দিলে কখনও চলে! তার ওপর ছেলেটার মাথা আছে। তুই দেখে নিস দেবু—ভানুকে ঠিক আমি একজন বড় বৈজ্ঞানিক করে গড়ে তুলবো।

—লাভ কি হবে? শেষ পর্য্যন্ত আপনার মত খেতে পাবে না।

টেবিলের ওপর একটা মুষ্ট্যাঘাত করে সমরবাবু বললেন, খুব খাঁটি কথা! কোন দেশের, কোন যুগের বৈজ্ঞানিক ঠিকমত পেট পুরে খেতে পায়নি, আমিও পাচ্ছি না। আমার ভাগ্নে ভানুও বৈজ্ঞানিক হয়ে খেতে পাবে না। এতে আশ্চর্য্য হবার বা দুঃখ করার কি আছে? কিন্তু বৈজ্ঞানিক তো হবে। নরানাম্ মাতুলক্রমঃ। কিন্তু গেল কোথা—গেল কোথা সে ব্যাটা বলতে পারিস?

—পরীক্ষার ফল জানতে বেরিয়েছে।

—পরীক্ষার ফল! পরীক্ষার ফল হবে তার কদলী—কদলী—পাকাকলা, কিচ্ছু হবে না—ও ব্যাটার কিচ্ছু হবে না। ও একটি অপদার্থ।

চেয়ারে বসে সমরবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। ভানুকে অপদার্থ বলায় ভয়ানক চটে গেছে দেবু, গুম খেয়ে সে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ সমরবাবু চেয়ার ছেড়ে ঘরময় পায়চারি সুরু করলেন। দেবুর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, অপদার্থ!

—আমি!

—Not you but Bhanu! ভানুকে বলছি।

—দাদাবাবু কিন্তু অপদার্থ নয়!

— Shut up! তুমি আমার ভাগনেকে আমার চেয়ে বেশী জানো।

— দাদাবাবু Matricএ first হ'য়েছিলেন।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন সমরবাবু। মিলিটারী কায়দায় চেয়ারে একটা পা তুলে দিয়ে বললেন, টুকে—শ্রেফ টুকে। মানে অঙ্কের খাতা দেখে Copy—হুবহু Copy করে। First হওয়া কি যে সে কথা! সে বটে আমি!

—May I come in?

—Oh yes! দরজার দিকে না তাকিয়েই বললেন সমরবাবু। ঘরে এসে ঢুকলেন প্রফেসর বটুবাবু। ইনি ভানুকে বাড়াতে প্রাইভেট পড়িয়ে থাকেন। ইনি বসতে বলার অপেক্ষা কোন দিনই রাখেন না— আজও রাখলেন না।

—Good morning Scientist! বলতে বলতে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

—Good morning Professor! Whats' the news, খবর কি?

—Good news sir আপনার ভাগনে ভানু এবছর I. Sc.তে first stand করেছে।

সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন সমরবাবু, হতেই হবে—হতেই হবে। আমার ভাগনে—মানে নরানাম্ মাতুলক্রমঃ। First না হয়ে যায়! এ আমি জানতাম Professor—এ আমি জানতাম! কেমন—আমি বলিনি দেবু, ভানুর মত বুদ্ধিমান ছেলে হাজারে একটা মেলে—হাজারে!

সমরবাবুকে চিনতে দেবুর বাকি নেই। চিরদিনই তিনি একটু একটু নয়—বেশ কিছুটা ছিট্‌গ্রস্ত। তবুও সে অবাক না হয়ে পারলে না। বললে, সে কি! আপনি তো এতক্ষণ অপদার্থ ব'লে দাদাবাবুকে গাল দিচ্ছিলেন!

—শুনলে Professor—শুনলে! আমার ভাগনে কখন অপদার্থ হতে পারে!

প্রফেসর সমরবাবুকে ভাল রকমই চেনেন। তিনি সমর্থন করে বললেন, ভানু আপনার নাম রাখবে। ওকে এবার ক'লকাতার একটা ভাল কলেজে ভর্ত্তি করুন।

—ভাল কলেজ! What do you mean by ভাল কলেজ?

—মানে—যেখানে পড়াশোনা ভাল হয়। যেমন ধরুন—Oriental College! College the Advance!

আঁতকে উঠলেন বৈজ্ঞানিক, কি বলছো Professor! ও সব কলেজে তো Co-education. পড়াশোনার চর্চ্চার চেয়ে প্রেম-চর্চ্চাই হয় বেশী।

বিনয়ে গদ-গদ হ'য়ে প্রফেসর বললেন, এটা Sir—আপনি কি বলছেন!

—'Matrimonial ব্যুরো' কাকে বলে জানো? ও সব কলেজ তাই।

সমরবাবুর প্রকৃতি অজ্ঞাত নয় প্রফেসরের। কাজেই তাঁর কথায় সায় দিয়ে কথার মার-প্যাঁচে এ ক্ষেত্রে রাজি করিয়ে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তিনি হেসে বললেন, আপনার কথা অবশ্য হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—তবে, Sir সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ছাত্র-ছাত্রীর মানসিক উৎকর্ষতার ওপর।

—That's right! তবে কিনা—

সমরবাবুকে কথা বলার অবসর না দিয়ে প্রফেসর মনোজ্ঞ এক উদাহরণের অবতারণা করলেন, জল আর দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে হাঁসের সামনে ধরলে—হাঁস জল বাদ দিয়ে দুধটুকুই পান করে—জলটা পড়ে থাকে! তাই নয়, Sir?

আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে সমরবাবু প্রফেসরের পিঠ চাপড়ে বললেন, good! তুমি Professor না হ'য়ে পুলিশ কোর্টের উকিল হলে না কেন Professor! যে কোন বিষয় নিয়ে তোমার তর্ক করার একটা বৈশিষ্ট আছে। বেশ—ভানু তার পছন্দ মত যে কোন একটা ভাল কলেজে ভর্ত্তি হোক।

—আর একটা কথা, Sir! এখানে থেকে daily Passengerই ক'রে কলেজ করার চেয়ে ভানুর উচিত College—Hostelএ গিয়ে ওঠা, পড়া শোনা তাতে ভালই হবে বলে আমি মনে করি।

—That's a good idea! আমি তোমার সঙ্গে একমত Professor! সে-ই ব্যবস্থাই হোক। আচ্ছা—আপনি এবার যেতে পারেন!

—আচ্ছা, নমস্কার! প্রফেসার চলে গেলেন।

সমরবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার পায়চারি সুরু করলেন। বলতে বলতে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলেন, গুলিয়ে গ্যালো—সব গুলিয়ে গ্যালো। বাড়ী ভাড়া—সংসার খরচা—Co-education—College—Hostel—নাঃ সব গুলিয়ে গ্যালো। কি যেন করছিলাম—দেবু? ও—নেই! Idiot! একবার ফাঁক পেয়েছে কি—সরে পরেছে! সরে পরলো—তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু সব কিছু গুলিয়ে দিয়ে সরে পড়লো। I see—Yes! খরগোস!

সমরবাবু খরগোসের খাঁচাটা এগিয়ে নিয়ে এসে পাশের উঁচু টুলটার ওপর বসলেন, একবার খরগোস আর একবার সেই তরল পদার্থ সমেত পাত্রটীর দিকে চেয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

—মামাবাবু! ঘরের বাইরে থেকে ভানুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

সমরবাবু গর্জ্জে উঠলেন, Again that disturbing element.

সমরবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই ভানু এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে।

—Cheer you—my boy! Congratulations! You have stood first in the University! Good!

—পথে Professor বাসুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

ভানুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সমরবাবু বললেন,—Don't delay! তাড়াতাড়ি গিয়ে কলেজে ভর্ত্তি হও। তোমার ওপর অনেক দায়িত্ব। আমার বংশের মুখরক্ষা—তোমাকেই করতে হবে—I mean তোমার বংশের! আচ্ছা তুমি এখন যেতে পারো।—শোন শোন! এই ওষুধটা যে কোন একটা খরগোসকে ধরে খাইয়ে দিতে পারো। আমি ঠিক ওদের control করতে পাচ্ছি না।

—এসব নিয়ে দিনের পর দিন কি পাগলামি কচ্ছেন? এর চেয়ে সেই সাবানটা বার করলে দু'পয়সা আসতো।

—কি বললে! পাগলামি! Do you mean to say I am a পাগল—madman! Rot! বোধহয় ঘৃণায় তিনি ভানুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বলতে সুরু করলেন, যে কোন যুগে—যে কোন দেশে—এই এদের মত অর্ব্বাচীনের মুখে বৈজ্ঞানিকরা ঐ আখ্যাই পেয়ে এসেছে। পাগল! পৃথিবীর কোন আবিষ্কার এক দিনের চেষ্টায় হয়নি। রীতিমত তপস্যা করতে হয়েছে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর। চাই ধৈর্য্য—চাই একাগ্রতা—চাই সাধনা। পাগল! আমি পাগল! একটা ডেঁপো—অকালপক্ক ছেলে আমায় বলে কি না—পাগল! কিচ্ছু হবে না—তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। বলতে বলতে সমরবাবু ঘাড় ফিরিয়ে ভানুকে দেখতে না পেয়ে বললেন, অ—ধৈর্য্য ধরে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শোনবারও অবকাশ হলো না! অপদার্থ।

—অপদার্থ! আমি একটি অপদার্থ! এক মাস হতে গেল তবু খরগোসের হাত থেকে রেহাই পেলাম না! বলে সমরবাবু বিরক্তিভরে খাঁচাটা একধারে ঠেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। চোখ বুজিয়ে সিগারেট টেনে যেতে লাগলেন ইজি চেয়ারে শুয়ে।

ভানু ঘরে ঢুকে নীরবে সমরবাবুকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। সমরবাবুর পায়ে হাত লাগা মাত্র তিনি চমকে চোখ চাইলেন।

—এ্যা! ও তুমি! আমি মনে করেছি—খরগোসটা বুঝি খাঁচা থেকে বেরিয়ে—

—আমি আজ যাচ্ছি—মামাবাবু!

সমরবাবু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তার আপাদ মস্তক দেখে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, যাচ্ছো—কোথা যাচ্ছো?

—কলেজে ভর্ত্তি হতে। আর আজ থেকে আমি হোষ্টেলেই থাকবো।

—ও তাই নাকি! তা বেশ। লেখাপড়া করতে যাচ্ছো—মনটা অন্যদিকে না দিয়ে—লেখাপড়ার দিকটাতেই দিও।

—আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না। 'অন্যদিক' মানে কি?

—কিচ্ছু না—! এই বললাম আর কি! Yes! I wish you good luck!

আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলে না ভানু। তবে কথাটা যে তাঁর একবারে অর্থহীন নয়—এটা বুঝলে, কিন্তু কি যে অর্থ—তা বুঝতে পারলে না। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

গেটের ধারে বাঁধানো রকের ওপর দেবু গালে হাত দিয়ে বসে আছে। রিক্সাওলা ভানুর বেডিঙ্টা রিক্সা থেকে নামিয়ে দেবুর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বলছে, লিজিয়ে আপকো মাল!

ভানু বেরিয়ে এসে অবস্থাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললে, কি হলো, দেবুদা?

মালটা নিজের মাথা থেকে নামিয়ে দেবু বললে, ব্যাটা বলে কি না—আমার মিটার উঠছে। তাই আর দেরী করতে না পেরে মালটা আমার মাথায় তুলে দিয়ে সরে পড়ছে।

হেসে ফেললে ভানু। রিক্সাওলাও রগড়ের হাসি হাসছে। দেবুর মুখে শুধু হাসি নেই। চোখ দুটো তার ছল-ছল কচ্ছে।

ভানু গিয়ে রিক্সায় উঠে বললে, তোর মিটার পুরিয়ে দেবো'খন। বেডিঙ্টা সুটকেশের ওপর তুলে দে।

দেবু রিক্সার কাছে এগিয়ে এসে বললে ধরা গলায়, কাজটা ভাল করলে না, দাদাবাবু! আমায় সঙ্গে নিলে পারতে!

ছেলেবেলা থেকে কোলে পিঠে ক'রে যাকে মানুষ করা যায়—তাকে কাছ-ছাড়া করা যে কি মর্ম্মান্তিক—তা দেবুর মত ভুক্তভোগীরাই বলতে পারে। ব্যথা তার অব্যক্ত! ঐ অব্যক্ত ব্যথা দু'ফোঁটা অশ্রু হয়ে পুঞ্জীভূত রয়েছে দেবুর চোখের দু'কোণে।

ভানুর চোখেও জল এলো। তাড়াতাড়ি দেবুর সামনে চোখের জল গোপন করবার জন্য বললে, পাগল হলে দেবুদা! তুমি শুদ্ধো চলে গেলে মামাবাবুকে দেখবে কে? এই রিক্সা—চলো!

রিক্সা চলে গেল। দেবু রিক্সার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। চেয়ে চেয়ে দু' চোখ তার জলে ঝাপসা হয়ে এলো। নবদ্বীপবাবু কখন যে পুঁটুরাণীকে সঙ্গে নিয়ে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে—তা সে খেয়ালই করেনি।

—এই যে দেবু! তারপর—কত দূর কি গড়ালো?

নবদ্বীপবাবুর কথা দেবুর কানেই গেল না—এমনি তন্ময় হ'য়ে সে তার দাদাবাবুর কথা ভাবছিল।

গলাটা কেসে দেবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নবদ্বীপবাবু বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, বলি কতদিন আর এ ভাবে আমাদের বাপবেটীকে ঝুলিয়ে রাখবে? আমার কাছে সাফ কথা—হয় বিয়ে দাও আর নয় ভাড়ার টাকা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দাও।

—কাকে বলছো?

—কেন—তোমাকে।

—ভাড়া দেবার মালিকও আমি নই আর বিয়ে দেবার মালিকও আমি নই। শুধু শুধু বেনাবনে মুক্ত ছড়িয়ে লাভ কি?

—ও! আয় তো মা পুঁটু—তোর হবু শ্বশুরের সঙ্গে একবার দেখা করে একটা হেস্তো-নেস্তো করে যাই।

দেবু দু' হাত দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে বললে, উঁ হুঁ—!

—তার মানে?

—আবিষ্কার!

—আমার বাড়ীতে আমায় ঢুকতে দেবে না!

—নিশ্চয় দেবো, তবে কারুর সঙ্গে দেখা হবে না।

নবদ্বীপবাবু লাঠি ঠুকে রকের ওপর বসে পড়লেন। বসে বসে গজরাতে লাগলেন।

এইবার পুঁটুরাণী মুখ খুললে, কারুর সঙ্গে দেখাই যদি না হয় তাহলে বাড়ীতে ঢুকে লাভ ?

—লাভ লোকসান জানো তোমরা !

—ভানুদা কোথা ?

ধরা গলায় দেবু বললে, দাদাবাবু তো আজ ক'লকাতায় পড়তে চলে গেল।

—আমার সঙ্গে দেখা না করেই ভানুদা কোলকাতায় চলে গেল। পুঁটুরাণীর প্রায় কাঁদবার অবস্থা।

—গেল গেল—বিয়েটা করে গেলেই পারতো ! মন্তব্য করলে নবদ্বীপবাবু।

—ঐটে ভুল হয়ে গেছে, নবদ্বীপদা !

—তুমি তো ভুল হ'য়ে গেছে ব'লে রেহাই পেলে কিন্তু পুঁটুরাণীকে নিয়ে আমি এখন কি করি বলো দেখি !

—কিছু ক'র্তে না পারো—একগাছা দড়ি আর একটা কলসী জোগাড় করে দাও ! ব'লেই দেবু সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

বৈজ্ঞানিক সমরবাবু সত্যিই তাঁর গবেষণা নিয়ে প্রায় পাগল হ'য়ে উঠেছেন। চোখ ছুটো জবা ফুলের মত টকটকে লাল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার কাঁচা পাকা চুল খাড়া হ'য়ে উঠেছে। ভদ্রলোককে দেখলে ভয় হয়।

সমরবাবু খাঁচা থেকে খরগোস বার ক'রে সারা অঙ্গ পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর গোটা কয়েক ছোলা তার মুখের কাছে ধরলেন। খোরগোসটা একটির পর একটি ছোলা খেয়ে ফেললে। সমরবাবু একটা বাক্সে খরগোসটাকে রেখে দিলেন।

খাঁচার সামনে একপাত্র তরল পদার্থ রাখা মাত্র তৃষ্ণার্ত্ত দ্বিতীয় খরগোসটা মুখ বাড়িয়ে ঐ তরল পদার্থ পান করলে।

সমরবাবু ঘড়ি দেখে তাঁর খাতায় সময়টা লিখে নিলেন। ঐ তরল পদার্থ পান করার সঙ্গে সঙ্গে খরগোসটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন তিনি বাক্সে রাখা খরগোসটাকেও বাইরে এনে ঐ ওষুধ খাইয়ে ছেড়ে দিলেন, সময়টা খাতায় লিখে নিলেন। এটাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

—পেয়েছি—আমি পেয়েছি ! Eureca ! Eureca ! চীৎকার করে, লাফিয়ে, সারা ঘরময় একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করে বসলেন সমরবাবু আনন্দের আতিশয্যে।

দোষ অবশ্য সমরবাবুর নয়। আবিষ্কারের আনন্দে মানুষ এমনি আত্মহারাই হয়—হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। অন্যের পক্ষে—বিশেষ করে দেবুর পক্ষে এটা পীড়াদায়ক। বেচারা দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর আশার স্বপ্নই দেখে আসছে। বাবু আবিষ্কার ক'রে প্রচুর টাকা আমদানি করবে আর সেই টাকায় সংসারটা অন্ততঃ স্বচ্ছলতার সঙ্গে সে চালাতে পারবে। কিন্তু কোথায় আবিষ্কার আর কোথায় টাকা ! শুধু বাবুর দিবারাত্র আস্ফালন আর অহেতুক চীৎকার শুনে শুনে সে বিরক্ত—পরিশ্রান্ত ; আজ আবার সেই চীৎকারের পুনরাবৃত্তি শুনে সে ঘরে ঢুকে বেশ কাংস কণ্ঠেই বললে, কি হলো—অমন পাগলের মত চেঁচাচ্ছেন কেন ?

—পাগল। সত্যিই আমি আজ পাগল ! এতদিন—এত দীর্ঘদিন চেষ্টার পর আমি আমার পাগলামির ফল পেয়েছি। I am successful my boy !

অন্যদিনের আস্ফালনের তুলনায় আজকের আস্ফালনটা কিছুটা অস্বাভাবিক—! হয় ভদ্রলোক আজ সত্যি সত্যি পাগল হ'য়ে গেছেন আর নয় একটা কিছু কাজের কাজ করেছেন। কেমন যেন ঘাবড়ে গেল দেবু।

খাঁচাটা দেখিয়ে সমরবাবু বললেন, কি দেখছো ?

—খাঁচা।

—আর ভেতরে কি ?

—এ্যাঁ ! খাঁচার ভিতরে কিছু না দেখে দেবু দস্তুরমত ভড়কে গেছে।

—খাঁচার ভেতরে কি আছে ?

—আজ্ঞে —কিছুই, নেই, ফাঁকা !

—ঠিক বলেছো। খাঁচার ভেতর ফাঁকা। আচ্ছা—নিয়ে এসো ঐ ছোলার বাটী !

দেবুর তথাকরণ।

—ধর এই খাঁচার মুখে।

দেবু খাঁচার মুখে অর্থাৎ খাঁচার ছোট দরজাটির সামনে ছোলার বাটী ধরলে। আশ্চর্য্য! নিজের চোখকে সে যেন ঠিক মত বিশ্বাস করতে পারলে না। একটির পর একটি ছোলা কোন অশরীরি জীব যেন টুপ্‌টুপ্‌ করে খেয়ে নিলে। শূন্য পাত্র হাতে নিয়ে বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে শূন্য খাঁচার দিকে চেয়ে স্থানুর মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দেবু।

—আর একটি ছোলাও পড়ে নেই। ব্যাটা পেটের জ্বালায় সব কটা ছোলা টুপ্‌ টুপ্‌ করে খেয়ে ফেললে। কেমন—বিশ্বাস হলো? হাঃ হাঃ হাঃ—

সমরবাবুর অট্টহাস্যে আপনাতে আপনি ফিরে এলো দেবু। বললে, তাজ্জব ব্যাপার! কিন্তু কিসে খেলে?

—খরগোস।

আর একবার খাঁচার ভেতরটা ভাল করে দেখে দেবু বললে, কৈ—খরগোসটা তো দেখতে পাচ্ছি না।

আবার সেই অট্টহাসি ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠে, হাঃ হাঃ হাঃ—উধাও—Vanished! অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে আছে—কিন্তু তুমিও তাকে দেখতে পাচ্ছো না আর আমিও পাচ্ছি না।

—কিন্তু—কিন্তু কি করে অদৃশ্য হ'লো?

রসিকতা সুরু করলেন সমরবাবু। মিষ্টি হেসে বললেন, বলবো কেন? তুমি ব্যাটা সব কিছু জেনে নিয়ে আমাকেই পথে বসাও আর কি!

—কি সব আবোল-তাবোল বকছেন!

সমরবাবু একটা বর্ম্মা সিগার মুখে নিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ে বললেন, ধরিয়ে দে!

দেবু পাখাটা বন্ধ ক'রে দেশলাই নিয়ে এগিয়ে এলো।

—আবার পাখা বন্ধ করলি কেন? ও—পাখার হাওয়ায় চুরুট ধরবে না। অপদার্থ—! বলে দেবুর হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে চুরুট ধরাতে ধরাতে ইসারায়

পাখাটা খুলে দিতে বললেন। চোখ বুজিয়ে চুরুটে গোটা কয়েক টান দিয়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে একবার হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর এগিয়ে খাঁচার সামনে। শূন্য খাঁচার দিকে মিনিট খানেক চেয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর একটা ওষুধের শিশি দেবুর মুখের সামনে তুলে ধরে বললেন, ওষুধ—এই ওষুধ খেয়ে খরগোসটা উধাও হ'য়ে গেছে।

ওষুধ খেয়ে একটা জানোয়ার উধাও হ'য়ে গেছে!

--চুপ! কথা বলো না। ও আবার রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে ফিরে আসছে—ঐ ছাখো! Just see the fun! ক'মিনিট লাগলো ফিরে আসতে? ব'লে হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললেন, চার—চার—চার মিনিট ছত্রিশ সেকেণ্ড!

সমরবাবু খাতায় সময়টা লিখে নিলেন।

—চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। একবারে পুরোদস্তুর ভেল্কী বাজি! আচ্ছা বাবু—মানুষকেও এইরকম অদৃশ্য করতে পাববেন?

—নিশ্চয় পারবো। এক ডোজ আমার এই ওষুধ খেলে একটা জ্যান্ত মানুষ স্রেফ হাওয়া হ'য়ে যাবে। অদৃশ্য হ'য়ে থাকার সময়টা শুধু এবার বাড়িয়ে যেতে হবে। ঐ চার মিনিটকে করতে হবে—চার ঘণ্টা, চার ঘণ্টাকে করতে হবে চার দিন, চার দিনকে করতে হবে—চার মাস, চার মাসকে করতে হবে—চার বৎসর! তারপর আরো—আরো—আরো দীর্ঘ দিন। আচ্ছা, এখন যেতে পারো। হ্যাঁ এক পেয়ালা কোকো!

পোড়া চুরুটটা এ্যাস-ট্রে থেকে তুলে নিয়ে আবার সমরবাবু ইজিচেয়ারে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। চুরুট ধরিয়ে চোখ বুজিয়ে ভ বতে সুরু করলেন।

দেবু চলে গেল সানন্দে তার প্রভুর জন্য কোকো তৈরী করতে। সমরবাবুর চেয়ে তার আনন্দ কোন অংশে কম বলে মনে হয় না। আবিষ্কার যেন সমরবাবু করেননি—করেছে দেবু!

* * * * *

ভানু গিয়ে কলেজে ভর্ত্তি হলো। ইণ্টারমিডিয়েটে সে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল-

এবার কিন্তু বি, এ, ক্লাসে ভর্ত্তি হলো। মামাবাবু চান তাকে বৈজ্ঞানিক করে তুলতে কিন্তু তা তার ধাতে সইবে না। সায়েন্সের কচ-কচি তার ভাল লাগে না। কবিজনোচিত মনোবৃত্তি তার! সায়েন্সের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বা ল্যাবরেটরীতে ঢুকলে তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে Hostel Superintendent এর সঙ্গে সে গেল Hostel-এ। আজ থেকে সে এখানে থাকবে।

Superintendent এর নির্দ্দেশে Hostel এর বেয়ারা বঁধুয়া ভানুকে সঙ্গে করে তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে পৌছে দিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে পশুপতিকে দেখে ভানুর যে আর আনন্দের সীমা থাকবে না—এ আর এমন বিচিত্র কি! ও হচ্ছে ভানুর গ্রামের ছেলে আর সহপাঠী। বন্ধু ভানুকে সাদর সম্ভাষণ জানালে। ভানু তার সহপাঠী, বন্ধু—এ তার গর্ব্বের কথা! ভানুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু হিসাবে তার মর্য্যাদাও যে কলেজে এবং হোষ্টেলে বাড়বে—এতেই তার আনন্দ।

—তুই যে এই কলেজে এসে ভর্ত্তি হবি তাতো আগে বলিসনি?

—তা কি ছাই আ—আ—আমি আগে জা—জা—জানতাম। বললে পশুপতি।

—এখানের আবহাওয়া কি রকম?

—খু—খু—খুব খারাপ। সে সব পরে শু—শু—শুনিস। ওরে বঁ—বঁ বঁধুয়া! আগে একটু জি—জি—জিরিয়ে নে।

বঁধুয়া এসে হাজির। বঁধুয়ার চেহারা কতকটা কলের পুতুলের মত। ফুট চারেক লম্বা—হাত, পা যেন তার দেহে আড়ষ্ট হ'য়ে লেগে আছে। খুপ্ খুপ্ করে তিন মিনিটের পথ এক মিনিটে হাঁটে। কোঠরে ঢোকা ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটিতে বুদ্ধি যেন জ্বল-জ্বল কচ্ছে। বঁধুয়া যে কোন লোকের হাসির খোরাকের উপাদান।

—দু' কাপ চা আর দুটো টো—টো—টোষ্ট! জ—জ—জলদী!

—O. K.! ব'লে চলে গেল বঁধুয়া—অর্থাৎ ঠিক যেন উড়ে গেল।

—কি যেন লোকটা ব'লে গেল ? জিজ্ঞাসা করলে ভানু।

—O. K. অর্থাৎ ঠি—ঠি ঠিক আছে। বঁধুয়া আগে বা—বা—বা বায়স্কোপে কাজ করতো। ব্যাটাকে ঐরকম দেখতে হ'লে কি হবে—ভা—ভা ভারী ওস্তাদ !

বঁধুয়া চা আর টোষ্ট নিয়ে এলো।

—রে—রে—রে—রেডি মেড্ ! দেখলে—?

* * * *

সারা কলেজে এদিকে ভানুকে নিয়ে একটা হৈ চৈ পরে গেছে—প্রত্যক্ষ ভাবে নয়—পরোক্ষ ভাবে। এবছর যে ছাত্র Intermediate Scienceএ Universityতে first হয়েছে—সেই ছাত্র এসে ভর্ত্তি হয়েছে এই কলেজে —সিট নিয়েছে এই কলেজেরই হোষ্টেলে।

প্রত্যক্ষ ভাবে কারোর সঙ্গেই এখনো ভানুর আলাপ হয়নি, তবু তাকে নিয়ে সারা হোষ্টেলে ছেলেদের মধ্যে সু ও কু নানা জল্পনা-কল্পনা সুরু হ'য়ে গেছে।

—ওঃ, first হয়েছে ব'লে ব্যাটার আর মাটিতে পা পড়ে না। আমাদের সামনে দিয়ে গট্-গট্ করে চলে গেল—একবার ফিরেও চাইলে না, দুটো আলাপও করলে না ! ব'লে অরুণ তার বন্ধুদের দিকে চাইলে—বোধ হয় সমর্থন পাবার জন্য।

অরুণ হচ্ছে দলপতি। তাকে সমর্থন করে জহর বললে, পাড়াগেঁয়ে ভুত ! পোষাকের বাহার দেখলি না।

—কি নাম যেন রে ? জিজ্ঞাসা করলে অজিত।

পাপু ঠাট্টার ছলে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, first যে হয়েছে তার নাম থাকবে ঠোঁটাগ্রে—I mean ওষ্ঠাগ্রে ! সেই first boyএর নাম তুই জানিস না—shame !

অজিত প্রায় ধমক দিয়েই বললে, আরে থাম বে। অমন রাত জেগে নাকে নস্যি গুঁজে, চা ধ্বংস করে পড়লে আমরাও first হতে পারতাম। না—কি বলিস অরুণ! অরুণ বললে, আরে ব্যাটা—টুকে মারলেই বা আটকাতো কে?

পাপুর মাথায় একটা চাঁটি দিয়ে অনুপ বললে, কোন কিছুই করলি না। করলি শুধু রকবাজি আর মেরে এলি গুলপট্টি! তোরা কেমন করে first হবি বল!

—মনে পড়েছে—মনে পড়েছে! ব্যাটার নাম ভানু!

অজিত বললে, ওঃ অরুণ ব্যাটার কি সাফ্ মাথা! নামটা ঠিক জুগিয়ে দিলে তো!

—তা ভানু মানে তো সূর্য্য! হোষ্টেলে আজ সূর্য্যোদয়। চারদিক আলোয় আলো। তা চল সব—সূর্য্যে গ্রহণ লাগিয়ে দেওয়া যাক্!

জহরকে সকলেই অনুমোদন করলে।

*　　　　*　　　　*

ওদিকে চা খেতে খেতে দু' বন্ধুর গল্প বেশ জমে উঠিছে।

—ভা—ভা—ভা—ভারি মজা হলো কিন্তু। একই গ্রাম থেকে এলুম একই ক—ক—কলেজে। আবার একই হো—হো—হোষ্টেলে। শুধু কি তাই—আবার একই ঘ—ঘ—ঘরে। ব'লে মাথার বালিসের তলা থেকে সিগারেট আর দেশলাই বার করলে পশুপতি।

—তুই আবার সিগারেট কবে ধরলি? জিজ্ঞাসা করলে ভানু।

—আমি কি আর ধ—ধ—ধরেছি। ধরিয়ে ছে—ছে—ছেড়েছে।

—ক'লকাতার কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে দেখছি উন্নতি হ'য়েছে, বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে ভানু বললে।

—তা সে উ—উ—উন্নতিই বল আর অবনতিই বল—হ'য়েছে স—স—সঙ্গ দোষে—ঐ হা—হা—হারামীদের পাল্লায় পড়ে। এ্যাই মরেছে! ঐ যে দেখ, পা—ঘরের দল এদিকেই আসছে! ব'লে পশুপতি তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট বরিয়ে প্যাকেটটা মশারীর চালে ছুড়ে দিলে।

—সিগারেটের প্যাকেটটা মশারীর চালে ছুড়ে দিলি কেন?

—না দিলে র-র—রক্ষে আছে! বকাসুর ব্যাটারা খেয়ে ভু—ভু—ভুষ্টি নাশ করে ছেড়ে দেবে। খু—ব সা—সা—সাবধান ভানু!

—ওরা কারা?

ঐ তো পা—পা—পাশের ঘরে থাকে। ভারি ধ—ধ—ধ—ধড়িবাজ সব—যাকে বলে born বখাটে।

—তার মানে? কলেজে পড়ে তো—

—পড়লে কি হবে। অভ্যেস এখনো বদলায়নি। যত সব র—র—রক নাম করা বকা ছোঁড়ার দল—বুঝলে না!

—তা ওদের অত ভয়টা কিসের? জিজ্ঞেস করলে ভানু।

—ভা—ভা—ভারি গুণ্ডা সব। কথায় কথায় র—র—র—রদ্দা চালায়। আসুন দা—দা—দাদারা। আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন ভা—ভা—ভানু মানে আমাদের ভানু। এবছর ফা—ফা—ফার্ষ্ট হ'য়েছে।

আদর, অভ্যর্থনার বালাই নেই। ঘরটা যেন নিজেদের বৈঠকখানা বা Club Room. কেউ বসলো বিছানার ওপর বালিস কোলে নিয়ে, কেউ বসলো চেয়ারে—সামনের টেবিলে দু' পা তুলে দিয়ে, কেউ বসলো টেবিলের ওপর দু' পা ঝুলিয়ে, আবার কেউ বা সিটের ওপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লো।

এদের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হ'য়ে গেল ভানু। এ ধরণের ছেলেদের সঙ্গে আগে কোন দিন মেশবার সুযোগ হয়নি তার।

'এ বছর ফার্ষ্ট হ'য়েছে!' পশুপতির এই কথার উত্তরে ভানুর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে অরুণ বললে, তাতো চেহারা দেখেই বুঝতে পাচ্ছি।

জহর ভানুকে জিজ্ঞাসা করলে, দাদা কি ডন-বৈঠক করেন ?

অজিত পিনিক কাটলে, ধ্যেং—পড়ে পড়ে দাদা আমাদের বাতাসে হেলে পড়ছেন।

আর থাকতে পারে না ভানু। সে এতক্ষণ বসেছিল—এবার দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দেখুন,—এই যে ক'খানা হাড় আপনারা দেখছেন, এ হচ্ছে দধীচির অস্থি। এই অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরী হবে। আর সেই বজ্রে আপনাদের মত অসুরের দল পুড়ে ভস্ম হ'য়ে বাতাসে উড়ে যাবেন। বুঝছেন-- আমি বাতাসে হেলি, আপনারা বাতাসে উড়বেন।

—বেড়ে বলেছে মাইরি! দাদা আমাদের রসিক আছে। কই হে—পশু-থুড়ি—থুড়ি-পশুপতি! সিগারেট ঝাড়ো, বাবা। তোমার ঘরে এলুম আমরা—আর তুমিই মুখ গোমড়া করে বসে রইলে! বলে অনুপ নিজের মুখটা ফুলিয়ে পশুপতির দিকে টেরা-চোখে চাইলে।

—সি—সি—সিগারেট ফুরিয়ে গেছে! ব'লে পশুপতি আড় চোখে মশারির চালটা একবার দেখে নিলে।

পাপু গদিয়ান চালে বিছানার ওপর উঠে বসে বললে, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে—আনাও!

বঁধুয়ার উদ্দেশে ডাক দেবামাত্র বঁধুয়া এসে হাজির।

অজিত বললে, বাবুরা সব গরম হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি কাপ কয়েক গরম চা আর এক প্যাকেট—, কি সিগারেট আনবে হে? আচ্ছা, কাঁচিই নিয়ে আয়। পশুপতি বাবুর account!

—One—two—three—four—five—six—seven—o.k. seven cups! লোক গণতি করে বঁধুয়া চলে গেল।

এদের এই জোর জবরদস্তি বেপরোয়া ভাব দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল ভানু। পশুপতি বললে ভানুর উদ্দেশে, কেমন—মি—মি—মিলছে তো!

এ হেন সময় সমীর গাইতে গাইতে এসে ঢুকলো—

"কি মোহিনী জান বধু—
কি মোহিনী জান।
পুরুষের প্রাণ নিতে
নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস বধু
দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু
তোমার পিরীতি॥"

জামা খুলতে খুলতে সমীর বললে, নরক যে গুলজার! ব্যাপার কি?

পশুপতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। সমীরকে হাত ধরে ভানুর কাছে টেনে এনে বললে, আপনার সঙ্গে প—প—পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন ভানুবাবু—মানে আমাদের ভা—ভা—ভানু। আমরা এক সঙ্গে প—প—পড়তুম। ইনি এবার Intermediateএ ফা—ফা—

—ফার্ষ্ট হয়েছেন। Welcome ভানুবাবু। রবির উদয়ে যেমন পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়—তেমনি আপনার আগমনে আমাদের এই Hostel-এর অজ্ঞান দূর হোক। ব'লে সমীর ভানুর সঙ্গে করমর্দ্দন করলে।

পশুপতি এবার সমীরকে উদ্দেশ করে ভানুকে বলছে, আর ইনি আমাদের u—u—u—universal—

বাধা দিয়ে সমীর বললে, সমীরদা! থাক্—তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না। আমার পরিচয়টা আমি নিজেই দিচ্ছি। তিনবারের বার কোন গতিকে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে—বছর চারেক হলো বি, এ পড়ছি। শুধু পড়িনি, পরীক্ষা দিচ্ছি আর কলেজের মেয়েদের সঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে প্রেম করার চেষ্টা করে চলেছি। Result! Result জানতে চাইবেন না—লজ্জা পাবো। প্রেমের দিক থেকেই বলুন আর পরীক্ষায় পাশের দিক থেকেই বলুন—Result একই। অর্থাৎ ফেল।

অরুণ এতক্ষণ চুপ করে একটা cinema পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল আর তারকাদের ছবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। বলা বাহুল্য কাগজ কিছুক্ষণ আগে হাতে নিয়ে সমীরই ঢুকেছিল। অরুণ কাগজের ওপর থেকে চোখ না তুলেই বললে, ভাল প্রেমের কবিতাও লিখতে পারেন সমীরদা!

—কত মেয়েকে প্রেমের কবিতা উপহার দিয়েছেন—তার হিসেব নিকেশ নেই। কবিতাগুলো এক সঙ্গে ছেপে একখানা 'কবিতাঞ্জলী' করা যেতে পারতো—জহর বললে।

জহরের কথার উত্তরে অজিত বললে, শুধু কবিতায় আজকালের মেয়েদের বুকও ভবে না আর মনও ভোলে না—সঙ্গে আর কিছু থাকা চাই।

গম্ভীর কণ্ঠে সমীর বললে, থাম—থাম সব কালকা যোগী। আমাকে এসেছে মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা শেখাতে।

তরুণ টিপ্পনী কাটলে, যা বলেছো সমীরদা! স্পর্দ্ধারও সব একটা সীমা থাকা উচিত। মায়ের কাছে মামার বাড়ীর গল্প।

—আমাকে একটু মেয়েদের প্রেম করা শেখাবে, সমীরদা? আর কিছু থাক বা না থাক—সুন্দর চেহারাটাতো আছে!

ব'লে অনুপ উঠে এসে সমীরের গা ঘেঁসে বসলো।

পাপু ওপাশ থেকে বলে উঠলো, ও কাজ তোর দ্বারা শেখা হবে না। তুই রাঙামুলো।

ঘর কাঁপিয়ে সবাই হেসে উঠলো।

সমীর বললে, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কি বলে জানো! বলে—মেয়েছেলের কাছ থেকে যতটা পাবো—দূরে সরে থাকবে। ও জাত বড় ভয়ানক—যাকে বলে ফেরোসাস্! তুলসীদাসের ভাষায় ওরা হচ্ছে—

"দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী
মুহু মুহু লহু চোষে
আর দুনিয়া সব বাউরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।"

বলে সমীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর গভীর খেদের সঙ্গে কতকটা যেন নিজের মনেই বললে, তবু তোমাদের সমীরদার জ্ঞান হলো না। আজও ছুটেছে ঐ বাঘিনীদের পিছনে পিছনে।

ঠিক এই সময় চা এসে গেল। সবাই উল্লসিত হয়ে যার যা মনে এল বলে চেঁচিয়ে উঠলো। অরুণ শুধু বললে, থ্রি চীয়ার্স ফর পশুপতি! উই অল ড্রিঙ্ক দাই হেলথ্।

পশুপতি শুধু আড়চোখে একবার ভানুর দিকে চেয়ে দেখলে।

—আরে মশারীর চালে কার সিগারেট? বলে জহর প্যাকেটটা তুলে নিলে।

পশুপতির মুখে কথা নেই।

—হাতালে বাবা প্যাকেটটা! মারো একটা ছুঁড়ে! বলে অজিত সিগারেট লুপে নেবার জন্য তৈরী হ'ল।

—বেওয়ারিসের মাল যখন—তখন মালিক নিজেকেই বলতে হবে। এই নে একটা! ব'লে একটা সিগারেট ছুঁড়ে দিলে অজিতের দিকে।

চা, সিগারেট আর বুকনি—এই তিনের সমন্বয়ে বৈকালিক আসর বেশ জমে উঠলো।

পরের দিন সকালে।

হঠাৎ নারীসুলভ কমণীয় কণ্ঠসঙ্গীত হোটেলে ভেসে এলো। বেটাছেলের হোটেলে নারীকণ্ঠের গান! অবাক হবারই কথা। এ কার কণ্ঠস্বর? কে এ নারী? কোকিলকণ্ঠীর দর্শন লাভের জন্য ছেলেরা যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় জমায়েত হলো। সবারই চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়! গানটা আসছে ভেসে বাথরুমের ভিতর থেকে। আচ্ছা মজাদার ব্যাপার তো!

অরুণ ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলে, কে গান গাইছে?

—তা তো জানি না।

কান খাড়া করে জহর বললে, সমীরদা নয়তো ?

ধমক দিয়ে অজিত বললে, তের ব্যাটা! শুনছিস না—মেয়েছেলের গলা।

—ব্যাটাছেলের হোটেলে মেয়েছেলে! তাজ্জব ব্যাপার!

—তা বাথরুমে এসে ঢুকলো কেমন করে ?

—বাথরুমটা খুলে দেখে আসবো ? জিজ্ঞেস করলে পাপু।

—সত্যি যদি কোন মেয়েছেলেই হয় ?

জহর হাতের ওপর তাল ঠুকে বললে, আমি বেট্ রেখে বলছি—আলবৎ মেয়েছেলে।

—সমীরদার কোন বান্ধবী-টান্ধবী হবে বোধ হয়! বেশ কিন্তু গায় মাইরি। আলাপ জমালে হয়!

লুঙ্গি পরে গামছা কাঁধে নিয়ে গান গাইতে গাইতে ভানু বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। সবাই হাসতে হাসতে প্রায় লুটিয়ে পড়লো।

—আপনি গান গাইছেন ?

—কি মনে হয় ? বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে ভানু বললে।

জহর বললে, আমরা মনে করেছি—

—কোন মেয়েছেলে—ষোড়শী তরুণী! যাদৃশী ভাবনা যস্য।

অরুণ বললে, Radioতে মেয়েছেলের ছদ্মনামে আপনি অনায়াসে গান দিতে পারেন।

—তথাস্তু। অনুরোধের আসরে সুপারিশ করে পাঠাবেন। টেলিভিসনের প্রচলন এখনও যখন এদেশে হয়নি—তখন এই ময়ুরহারা ময়ুরবাহনকে আপনাদের মত শ্রোতারা উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা বা ঐ ধরণের একটা কিছু মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন। আপাততঃ আর কিছুক্ষণ এই ভিজে লুঙ্গি পরে রসালোচনা করলে উর্ব্বশীর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠবে। অতএব cheer you! বলে ভানু এবার পুরুষালী গলায় গান গাইতে গাইতে তার ঘরের দিকে চলে গেল।

সকালের দিকে ছুটির দিন ছাড়া বড় একটা আড্ডা জমে না। বাবুদের ঘুম

ভাঙতে ভাঙতেই আটটা! তারপর চা আছে, জলখাবার আছে, আর সঙ্গে খবরের কাগজ। তারপর স্নান সেরে খাওয়া—খেয়ে উঠে প্রসাধন শেষে কলেজ।

ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে। ভানু, পশুপতি ও অন্যান্য ছেলেমেয়েরা প্রফেসর আসবার আগেই ক্লাসে এসে বসেছে। বাবুঃ বেঞ্চ কিন্তু এখন খালি। বাঙলার ক্লাস। আরে ছোঃ! ধীরে সুস্থে খাওয়া দাওয়া সেরে একটা সিগারেট টেনে গেলেই বা ক্ষতিটা কিসের! পারসেনটেজ? ও প্রক্সির ব্যবস্থা আবহমানকাল থেকে চলে আসছে।

প্রফেসর রোল কল ক'রে গেলেন। অরুণের দলের বন্ধুরা তাদের প্রক্সি দিয়ে প্রেজেণ্ট করিয়ে দিলে। পড়ানো সুরু হলো।

"চপলা হেরি সত্বর কহিলা হে পঞ্চশর,
হেথা গতি কোথা হতে বল।
আছো তো, আছো ত ভাল গোরা ছিলে হলে কাল,
তোমার ও রতির কুশল?"

ইতিমধ্যে বাবুঃ বেঞ্চ ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। অরুণের দল পান চিবুতে চিবুতে পাশাপাশি এসে বসেছে। একটা কিসের ঠোঙা বার করে অরুণের হাতে দিলে। অজিত ঠোঙার ভিতর হাত ঢুকিয়ে একমুঠো ভরে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে, ধ্যেৎ ব্যাটা! শুকনো ছোলা আনতে হয়! ভিজে ছোলা কেমন লাগে!

প্রফেসর পড়ে যাচ্ছেন—

"শুনি নাকি মালাকার হয়ে এবে আছ যার
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও!"

হঠাৎ প্রফেসরের দৃষ্টি পড়লো যে বাবুঃ বেঞ্চ থেকে নিক্ষিপ্ত ছোলা এসে মেয়েদের গায়ে মাথায় পড়ছে।

—That's bad—very very bad! আমি এদিকে বকে মরছি আর তোমরা ওদিকে—very very bad! মেয়েরা সব আমার এই সামনের বেঞ্চে উঠে এসো। দাও—তোমরা সব সামনের বেঞ্চটা খালি করে দাও। Yes—that's I want! এবার যার যার পকেটে কড়াইভাজা আছে—সব খেয়ে

ক্ষ্যালো। পয়সার জিনিষ ছোঁড়া-ছুঁড়ি করে নষ্ট করতে নেই। বলে প্রফেসর গোটা ক্লাসের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

মেয়েদের মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে দেখে তিনি আরো চটে গেলেন। চোখের চশমা কপালের ওপর তুলে দিয়ে বললেন, অধ্যয়নম্ তপঃ। তপ করতে করতে কোন মুনি ঋষিকে হাসতে শুনেছো—না কড়াইভাজা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে শুনেছো! That's bad—very bad!

জহর দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'এরা sir—একেবারে ইন্‌করিজিবেল এণ্ড আনম্যানেজেবল।

—Thank you for thy gratis opinion! বলে প্রফেসর পাঠ্য পুস্তকখানা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলেন।

অরুণ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, পঞ্চশর অর্থে কি বোঝাচ্ছে, sir?

—পঞ্চশর অর্থে রতিপতি অর্থাৎ মদন। আর কারো কিছু জিজ্ঞাসা আছে?

অজিত অতি বড় ভাল ছেলের মত বললে, মন দিয়ে কেউ কি শুনছে? sir—যে জিজ্ঞসা করবে!

—আমি আপনার কথার প্রতিবাদ করি। দাঁড়িয়ে উঠে বললে ভানু।

ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন মাথা নীচু ক'রে বললে, এইরে—এইবার first boy ক্ষেপেছে!

—ক্লাসে বসে প্রফেসরের সামনে মেয়েদের গায়ে যারা কড়াইভাজা ছুঁড়ে মারেন—ক্ষ্যাপা তাঁরা—না ক্ষ্যাপা আমি!

—চুপ্ খান ভানুবাবু—চুপ্ খান। এঁরা সব অর্বাচীনের ন্যায় বাকবিতণ্ডা করত্যাছেন!

—বসো না বাবা—ঢাকাই। বেশী তড়পাচ্ছো কেন! বললে জহর।

—Silence! I say—silence! ভানু—মানে তুমিই এ বছর first হয়েছো—না? তুমি আমার সামনে—এই এ ধারে এসে বসো।

প্রফেসরের নির্দ্দেশে ভানু এসে বসলো। মেয়েদের কাছ থেকে খুব বেশী

তফাৎ নেই দেখে বাবুস বেঞ্চ থেকে একটা চাপা হাসির রোল উঠলো। ভানু একবার পিছন ফিরে দেখলে।

সমীর এবার দাঁড়িয়ে উঠে বললে, ছোট ছেলেদের মত নিজেদের ভেতর শুধু ঝগড়া। এদের গা থেকে sir—স্কুলের গন্ধ এখনো যায়নি।

প্রফেসর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, Take your seat! Don't disturb me boys! শোন মন দিয়ে—

"নিজ করে গাঁথ মালা সাজাতে দানব বালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও,
এত গুণপনা তব জানিলে হে মন ভব,
নিত্য গাথাতাম পুষ্পহার।"

প্রফেসর বইয়ের দিকে চোখ রেখে পড়ে যাচ্ছেন। প্রথমে খালি হ'য়ে গেল বাবুস বেঞ্চ। তারপর টুপ্ টুপ্ করে একটির পর একটি ছেলে চুপি সাড়ে পা টিপে টিপে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

"থাকিতে সে অন্যমনে ত্যজি পুষ্প শরাসনে,
ত্রিভুবনে পাইত নিস্তার!"

ব্যাখা করে জিনিষটা বোঝাবার জন্য প্রফেসর মুখ থেকে বই নামালেন। নামিয়ে দেখলেন—সামনের গোটাকয়েক বেঞ্চ বাদ দিয়ে গোটা ক্লাস রুম ফাঁকা হয়ে গেছে। তীব্র ও তিক্ত কণ্ঠে প্রফেসর বললেন, চুপিসাড়ে সব সরে পড়েছে! Report করবো—আজই Principalকে report করবো। বাংলার ক্লাস ব'লে কি এটা ক্লাস নয়! মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা—তাচ্ছিল্য! বেশ—এই আমি চললাম report করতে!

প্রফেসর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস ফাঁকা হয়ে গেল। ভানু মনোযোগের সঙ্গে বৃত্রসংহারের ঐ কটা লাইন পড়ে খাতায় ব্যাখাটা লিখছিল। পিছন থেকে সাবিত্রী এসে ডাকলে, ভানুবাবু!

ভানু চোখ তুলে দেখলে—মেয়েটি ক্লাসে ঐ কোণের দিকে বসেছিল।

—আপনার সঙ্গে আমার এখনো আলাপ হয়নি!

এ কথার উত্তরে কি বলবে—ঠিক জুগিয়ে উঠতে পারলে না ভানু। একবার মনে হলো—মেয়েটা একান্ত গায়েপড়া, আবার মনে হলো—অতি সাদাসিধে সরল মেয়ে। এক পুঁটুরাণী ছাড়া অন্য কোন তরুণীর সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত সে সহজ ভাবে মেলামেশা করেনি। পুঁটু অশিক্ষিতা, একান্ত গ্রাম্য, মিশতে বাধো-বাধো ঠেকে না, কিন্তু এ হলো দস্তুর মত সহুরে, তার ওপর শিক্ষিতা।

মেয়েটিই উদ্ধার করলে ভানুকে। বললে, এই শেষ দু' লাইন কবিতা আমায় একটু বুঝিয়ে দেবেন?

মেয়েটির কণ্ঠস্বর অতি স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক। ঠাট্টা, বিদ্রূপ বা পরীক্ষা করে দেখবার মত হাবভাব তার ভেতর নেই। জানবার বা বোঝবার ইচ্ছা তার সক্রিয় এবং সাবলীল।

—বেশ—common-room এ চলুন! ব'লে উঠে দাঁড়াল ভানু।

চলতে চলতে মেয়েটি বললে, ওদের ব্যবহারে আপনি আজ মনে মনে খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছেন—না?

—হলে কি হবে বলুন! ওদেরি দল ভারি।

—First একজনই হয় ভানুবাবু, দল বেঁধে first হওয়া যায় না!

এমনি ভাবে মেয়েটি বললে যে ভানুর সব কিছু দ্বিধা, জড়তা, মনের বিরক্তি ভাব এক লহমায় কেটে গেল। মিষ্টি চোখে ভানু মেয়েটির দিকে চাইলে—চার চোখে হলো চাওয়া-চাওয়ি। এই চাওয়া-চাওয়িটা শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া-পাওয়িতে দাঁড়াবে কিনা—জানে একমাত্র ভবিষ্যৎ!

অরুণের দল আগেই এসে আড্ডা জমিয়েছে common-roomএ—এখন তাদের এক ঘণ্টা লিজার। আসর তাদের বেশ জমে উঠেছে। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে - ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী কে? কেউ বলছে, সাবিত্রী। কারো মতে—নমিতা। আবার কেউ বা বলছে, সুন্দরী যদি বলতে হয় তো পপিকে।

সঙ্গে সঙ্গে কাটান দেওয়াও চলছে। ধ্যেৎ—কি যে তোর পছন্দ! অমন বব ছাঁটা ধিঙ্গী মেয়ে কখন সুন্দরী হয়! নাম কি-না পপি! আরে পপিতো কুকুরের নাম হয়।

হাসির রোল উঠলো।

জহর বললে, আমি কিন্তু যার নাম বলবো—তাকে Beauty Queen বলা চলে।

—বুঝেছি। তাই বুঝি বার বার তুই সুললিতার দিকে চাইছিলি। বলিহারি তোর beauty জ্ঞান! রঙটা কটা হলেই বুঝি সুন্দরী হয়। তাহলে চিনে-পাড়ায় যা—হাজার হাজার সুন্দরীকে পিঠে ছেলে বেঁধে জুতো সেলাই করতে দেখবি।

অজিত অনুপের পিঠ চাপড়ে বললে, বেড়ে বলেছিস মাইরি! চামচিকে আবার পাখী—সুললিতা আবার মেয়েছেলে! কি লম্বা রে বাবা! ব্যাটাছেলে হ'লে গ্যাস পোষ্টে সিগারেট ধরিয়ে খেতো। ঠোঁটে লিপষ্টিক দিয়েছে—মনে হচ্ছে যেন মানুষ খেয়েছে। পেত্নী—পেত্নী—জলার পেত্নী। দলছাড়া, গোত্রছাড়া হ'য়ে বাপ-মার পুণ্যের জোরে ছিটকে পড়ে এখানে এসেছে।

অরুণ বললে, তোরা যাই বলিস—ডলি মেয়েটাকে আমার মন্দ লাগে না।

—ঐ মুটকী! বাপ্—ট্রাম, বাসের দরজা দিয়ে কাৎ হয়ে ভেতরে ঢোকে। একটা রিক্সায় একলাকে আঁটে না। খোঁজ করে দেখিস—ওদের বাড়ীতে হয় তিনখানা ration card ওর জন্যে বেশী করে করান আছে আর নয় প্রতি সপ্তাহে ওর জন্যে black-এ ওর বাপ-দাদাকে চাল কিনতে হয়।

অজিতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সমীর বললে, তার ওপর বেঁটে, আবার ট্যারা।

—আমি যার কথা বলছি—সে ঐ আসছে—ভাল করে সবাই চোখ চেয়ে ছাখ্।

জহরের কথায় সবাই পিছন ফিরে দেখলে—ভানু আর সাবিত্রী।

—কিন্তু ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে! বলে ট্যারা হ'য়ে ওদের দিকে চাইলে সমীর।

অজিত ফিস্ ফিস্ করে বললে, এরা দুজনে ভাব জমালে কখন?

—We are all worthless! চল সব এক কাপ করে চা খেয়ে আসা যাক, ব'লে অরুণ বই খাতা নিয়ে উঠে পড়লো।

সমীর উঠতে উঠতে সখেদে বললে, Oh God ! আসছে জন্মে আমি যেন একবারের জন্যও first হই। টুক্‌নিফাই করেও যদি হ'তে হয়—তাও স্বীকার।

অরুণের দল common-room ছেড়ে চলে গেল।

ভানু এসে অপেক্ষাকৃত নিরালা একটা কোণ বেছে নিয়ে সাবিত্রীকে বসতে ব'লে নিজে বসলো। কোন কিছু ভূমিকা না করেই বললে, বইটা খুলে বলুন—কোন লাইন দুটো বুঝতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে ?

—আচ্ছা ওরা আমাদের দেখে common-room ছেড়ে কেন চলে গেল—বলুন তো ?

—যাবার আগে কারণটা তো আমায় বলে যায়নি।

—আপনি বেশ কাটা কাটা কথা বলেন !

লজ্জিত হলো ভানু। বললে, কিছু মনে করবেন না ! পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমি। ঠিক সহুরে ছেলের মত ইনিয়ে বিনিয়ে মোলায়েম করে কথা বলতে আজও আমি শিখিনি। দোষটা অবশ্য আমার। আমার এই কাঠখোট্টা স্বভাবের জন্যে অনেক অপবাদই আমায় মাথা পেতে নিতে হয়। আরো কি যেন বলতে গিয়ে ভানু নিজেকে সংযত করলে।

স্মিত হাস্যে মেয়েটি বললে, বলতে বলতে থামলেন কেন ?

—প্রথম আলাপেই সব কথা বলা ভালো কি !

—এই তো আপনি সহুরে হ'য়ে উঠছেন। পেটে আধখানা আর মুখে আধখানা থাকে মেয়েদের আর নয় সহুরে লোকের !

মেয়েটির কথার সাবলীল গতি মুগ্ধ করলে ভানুকে। বললে স্নিগ্ধ কণ্ঠে, আমি তাহলে আপনার কাছে ধরা পড়ে গেলুম। হাজার হলেও আপনি তো সহুরে মেয়ে মনের কথা ধরে ফেলা আপনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আসল কাজের কাজই যে আমরা ভুলে আছি—বই খুলুন !

—কাজের কাজ আমিও ভুলিনি আর আপনিও ভোলেন নি, তবে কথাটাকে অন্য কথা দিয়ে চাপা দিতে চাইছেন। বলুন না লোকে আপনাকে কি অপবাদ দেয় !

বইখানা খুলতে খুলতে ভানু বললে, কি আর বলবে! বলে—আমি নাকি অহঙ্কারী। First হয়েছি ব'লে কারো সঙ্গে ভালো ক'রে মিশি না—কথা বলি না। এই আর কি। যাক্‌গে ওসব বাজে কথা। শুনুন—এই শেষ দু' লাইন তো! দেখুন মদনদেব পুষ্পশর হেনেই তো বিপদ ঘটান। সারা বিশ্বের মেয়ে-পুরুষ রতি-পতির জ্বালায় উত্যক্ত। তিনি যদি ফুলধনু ত্যাগ করে অন্য কাজে মন দেন— তাহলে বুঝতেই পাচ্ছেন—মেয়ে-পুরুষ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। কেমন—এবার clear হয়েছে?

—দাঁড়ান একবার পড়ে দেখি। ব'লে মেয়েটি ভানুর হাত থেকে বইখানা টেনে নিয়ে পড়তে সুরু করলে :—

"এত গুণপনা তব জানিলে হে মনভব
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার।
থাকিতে যে অন্য মনে ত্যজি পুষ্প শরাসনে,
ত্রিভুবনে পাইত নিস্তার।'"

—হ্যাঁ—ত্রিভুবনে পাইত নিস্তার!

— অর্থাৎ মদনদেবের চক্রান্তে নারী আর পুরুষ—একে অন্যের প্রতি আসক্ত হয়ে অশেষ জ্বালা যন্ত্রনা ভোগ করে। মদনদেব অন্য কাজে অন্যমনস্ক হলে মানুষ শান্তি পায়।

মেয়েটি অর্থপূর্ণ হাসি হেসে কটাক্ষপাত করলে। সে কটাক্ষের অর্থ ভানু ঠিক বুঝলে কি বুঝলে না—বলা শক্ত।

—Now it is clear. Thank you. আপনি যে এত ভাল বোঝাতে পারেন—তা আমার—। কথা অসমাপ্ত রেখে আবার সেই মারাত্মক মনমাতানো হাসি হাসলে সাবিত্রী ভানুর চোখের দিকে চেয়ে।

ভানুর মুখ চোখের কোন পরিবর্ত্তনই হলো না।

—আপনি এখন উঠবেন না?

ভানু বললে, না। লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে আমি একটু পড়াশোনা করবো।

—আচ্ছা, কাল আবার ক্লাসে দেখা হবে। নমস্কার! বিদায় নিয়ে সাবিত্রী চলে গেল।

Common-room-এর একধারে library. ভানু বই নিতে উঠে গেল। বই নিয়ে ফিরে এসে দেখলে—অরুণের দল তার জায়গাটি অধিকার করে বসেছে। ভানু আর এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিলে। মিনিট কয়েকের মধ্যে অরুণের দল এসে তাকে ঘিরে ফেললে। উদ্দেশ্য তাদের অতি মহৎ। সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মত ভানু নীরবে ওদের দিকে চোখ তুলে চাইলে।

—এই Lucy Grey—কবিতাটা আমাদের একটু বুঝিয়ে দেবেন? বললে দলপতি অরুণ।

—তার মানে।

জহর বললে, মানে—Poet কি ভাবে Lucyকে ভালবাসতেন?

অজিত বললে, অর্থাৎ ভালবাসা অর্থে love—না affection! বাৎসল্য —না প্রেম!

কোন কিছু জানবার সত্যিকার আগ্রহ যে ভাষায় প্রকাশ পায়—এ তা নয়। এ শুধু অন্যকে অপদস্থ করে আত্মপ্রসাদ লাভের একটা ছল মাত্র। বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে উঠলো ভানুর। নিজেকে সংযত করে সে শুধু বললে, আমি প্রফেসর নই—আপনাদেরই মত ছাত্র।

—আপনি হ'লেন first boy—I man, আপনি have stood first in the University!

—First হওয়াটা কি আমার অপরাধ!

—তাহলে আপনি বোঝাতে পারবেন না কেন?

—বোঝাবার ক্ষমতা থাকলে আমি আপনাদেরই মত ছাত্র না হয়ে প্রফেসর হতাম। ব'লে বই খাতা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ভানু।

জহর পথ আগলে বললে, তাহলে ছাত্র হয়ে কি করে সাবিত্রীকে তো— —

—ও মেয়েটির নাম বুঝি সাবিত্রী? কথাটা যেন নিজের অজান্তে বলে ফেললে ভানু।

—কিছুই জানেন না দেখছি! অথচ লটাপটি তো এরি মধ্যে খুব! ব'লে ট্যারা হ'য়ে গেল অজিত।

—কি বললেন?

—আহা-হা চট্‌ছেন কেন। আমরা ঐ দরজার পাশ থেকে আড়ি পেতে সব শুনেছি।

—আপনার বাহাদুরী আছে মশাই। গাছে না উঠতেই একবারে এক কাঁদি! ভাগ্যিস আড়িটা পাতলুম, নইলে—

ভানু তখন রীতিমত চটে গেছে। রাগের মাথায় বলে বসলো, দেখুন—এটা বাসর ঘর নয়—common-room. আর আমি বর নই আর সাবিত্রী আমার বিয়ে করা বউ নয় যে আড়ি পেতে আপনারা প্রেমের কথা শুনবেন। Rot!

গমনোদ্যত ভানুর দিকে চেয়ে অরুণ বললে, কিন্তু আমাদের আর্জ্জি?

ভানু ফিরে দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে বললে, আপনাদের হিংসার পাত্র হবার মত কোন কাজ আমি করিনি। Don't be jealous প্লিজ!

ভানু চলে গেল।

—উঃ কি ছেলেবে বাবা! ভাঙবে তবু মচকাবে না। চল সব—ডেরায় ফেরা যাক্। বলে অরুণ সদলে common-room থেকে বেরিয়ে এলো।

—ভানুবাবু!

সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল ভানু নারীকণ্ঠের ডাক শুনে। সাবিত্রী Routine-boardএর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে গিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হলো। কয়েক মিনিট আগের 'সমালোচনা' এখনো তার মন থেকে মুছে যায়নি। ইচ্ছা না থাকলেও ভানুকে বলতে হ'লো, বাড়ী যাননি?

একগাল হেসে সাবিত্রী বললে, Routineটা টুকে নিচ্ছি।

—নিন্। তা—তা—ডাকলেন কেন?

—এমনি। ব'লে সাবিত্রী Routine টোকবার ভান করলে।

—এমনি নয়। সত্যের অপলাপ করে লাভ কি! আপনি আমায় কে ডেকেছেন—আমি জানি। ব'লে ভানু বোর্ডের সামনা-সামনি এগিয়ে এলো

—বলুন তো কি জানেন? ভানুর প্রায় গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল সাবিত্রী।

—Routineটা টুকে দেবার জন্য।

—তার মানে? আমি তো নিজে Routine টুকছিলাম।

—উঁহু—ধরা পড়ে গেছেন। Routine আপনি ঠিক টুকছিলেন না— টোয়ের ওপর ভর দিয়ে টোকবার চেষ্টা কচ্ছিলেন নেঙ্চে। কিন্তু চেষ্টা কবে পাচ্ছিলেন না। তাই আমাকে ডাকলেন।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য কণ্ঠে ফুটিয়ে সাবিত্রী বললে, বাজে কথা।

হেসে ফেললে ভানু। বললে, তা এতে লজ্জা পেয়ে আসল ব্যাপার লুকোবার কি আছে? ব্যাটাছেলের তুলনায় মেয়েরা সাধারণতঃ একটু বেঁটে হ'য়ে থাকে। কেমন—তাই নয়? Excuse me! নিন্—আমি বলে যাই - আপনি টুকে নিন্। বি কিউব অর্থাৎ বিনোদ বিহারী ব্যানার্জ্জি— মানে প্রফেসরের নাম। ইংলিশ—শুধু ই-এন্-জি লিখুন। রুম নম্বর ফোর।

—আমি কি নতুন Routine টুকছি যে—অত ব্যাখ্যা করে বলছেন সব কিছুই কি বৃত্র-সংহার কাব্য। সংক্ষেপে বলুন—Please! ব'লে ভানুর দিকে চেয়ে হাসলে সাবিত্রী।

ওদের Routine টোকা চলতে থাকলো। ওদের অলক্ষ্যে কিন্তু বেশ খানিকটা দূরে সদলে অরুণ এসে হাজির হ'য়ে গেছে। আর কথা আছে ওদের দু'জনকে একত্র দেখে টিকা-টিপ্পনি সুরু হ'য়ে গেল নিজেদের মধ্যে।

—ত্থাখ—ত্থাখ—চেয়ে ত্থাখ। উঃ দরদ দেখে আর বাঁচিনে। আবার Routine dictate করা হচ্ছে।

—আমাদের বললে—আমরা কি dictate করতে পারতাম না!

—পারতাম কিন্তু মনের মত হতো না।

—Routine dictate করবার জন্যে তাহলে কি একজন মনের মানুষ চাই নিজেদের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠলো।

—যেখানে সাবিত্রী—সেখানে ভানু। যেখানে ভানু—সেখানে সাবিত্রী।

অসহ্য! বললে জহর।

—দেখছিস না—এরি মধ্যে একবারে হরিহর আত্মা!

—যা বলেছিস! নামটা ওর ভানু না হ'য়ে সত্যবান হওয়াই উচিত ছিল।

—এ সময় সমীরদা থাকতো—ঠিক একটা লাগতাই কবিতা আউড়ে দিত।

গাইতে গাইতে ঠিক এই সময় সমীরের নাটকীয় প্রবেশ।

"সই! কে বলে পিরীতি ভাল—
পিরীতি সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

আবার হাসির রোল উঠলো।

ভানু বললে সাবিত্রীর উদ্দেশে, complete?

—হ্যাঁ—complete! চলুন—ওরা আমাদের দিকে চেয়ে হাসাহাসি বে কি যেন সব বলাবলি কচ্ছে।

তাচ্ছিল্য ভরে ভানু বললে, ও কিচ্ছু নয়। আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বার ওরা একটু সুযোগ খুঁজছে। ঠিক সুবিধা করতে পাচ্ছে না ব'লে দাঁড়িয়ে দ হয় নিজেদের মধ্যে আপশোষ কচ্ছে।

—চলুন—চলুন! এসব হ্যাংলাপনা দেখলে আমার বিশ্রী লাগে।

—বেচারাদের একটু শান্তি দিয়ে এলেই পারতেন!

কৃত্রিম ঝঙ্কারের সঙ্গে সাবিত্রী বললে, আঃ কি হচ্ছে! আসুন—

—ওরা যে চলে গেল! বললে অনুপ।

অজিত বললে, যাবে না তো কি Routine-boardএর সামনে দাঁড়িয়ে দিন রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেম করবে। যত সব—চল্—চল্—বড্ড খিদে পেয়েছে।

সমীর গান ধরে ওদের পিছনে পিছনে চললো—

"আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
সই! কেমনে ধরিব হিয়া।"

কলেজ আর হোষ্টেল পাশাপাশি। হোষ্টেলের দোতলার বারাণ্ডায়—ঠিক সিঁড়ির মুখে দেয়ালের গায়ে টাঙান আছে সার্ব্বজনীন চিঠির বাক্‌সো। অরুণ দোতলায় উঠেই চিঠির বাক্‌সে হাত দিয়ে এক গোছা চিঠি তুলে নিলে। একখানার পর একখানা দেখে চিঠির বাক্‌সে রাখলে। শুধু একখানা খামে ভর্ত্তি চিঠির ঠিকানায় চোখ রেখে বললে, খামে ভ'রে ভানুবাবুকে চিঠি লেখবারও তা'হলে লোক আছে—দেখছি। যতটা গোবেচারী আমরা ভেবেছিলাম—ততটা তাহলে নয়!

অজিত মন্তব্য করলে, বাবা—ডুবে ডুবে জল খায়—শিবের বাবাও টের পায় না!

জহর খামখানা অরুণের হাত থেকে নিয়ে বললে, ঠিকানাটা যেন হুবহু মেয়েলি ধাঁচের লেখা!

অনুপ উঁকি মেরে বললে, সাড়ে চুয়াত্তর নেই—এই যা রক্ষে।

পাপু বললে, শ্বশুরবাড়ী ব্যাটার যখন নেই—তখন চিঠিখানা নিশ্চয়ই পাশের বাড়ীর হবে!

—পরের চিঠি নিয়ে—বিশেষ করে কোন ভদ্রমহিলার গুপ্ত প্রেমপত্র নিয়ে তোমাদের এ ধরণের objectionable মন্তব্য—আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না। চিঠির মালিক আমি হলে—আজ তোমাদের সঙ্গে আমার তো একটা ফাটাফাটি হয়ে যেতো! দাও—যার চিঠি তার কাছে বঁধুয়া মারফৎ পাঠিয়ে দাও!

সমীরের কথামত চিঠিখানা বঁধুয়া মারফৎ ভানুর কাছে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

ভানু ঘরে ঢুকে দেখলে পশুপতি তার সিটে চিৎপাৎ হ'য়ে সিগারেট টানছে।

—বাংলার ক্লাসের পর কোথায় ছিলি রে? জামা খুলতে খুলতে ভানু জিজ্ঞেস করলে।

—আর তি—তি—তিনটে ক্লাস তো মাত্র ছিল—তাও আবার প্র—প্র—প্রফেসররা আসেননি। কা—কা—কাজেই ছুটি।

—ছুটি তো বটে কিন্তু ছিলি কোথা ?

—ঐ তোর টিফিন দিয়ে গেছে।

—তাতো দেখতেই পাচ্ছি আর যা খিদে পেয়েছে—হাত মুখ না ধুয়ে খেয়েও নিচ্ছি, কিন্তু তুই কোথা গেসলি তাই বল! ব'লে ভানু খেতে সুরু করলে।

—ভবি দেখছি ভো—ভো—ভোলবার নয়। তবে শোন। জা—জা—জানিস, সে এক ভা—ভা—ভারি মজার ব্যাপার। তবে আজ ভা—ভা—ভাঙচিনি। আগে পা—পা—পাকাপাকি হোক, তারপর।

—ঠিক আছে। আমাকে তোদের বাড়ীতে কি রকম বিশ্বাস করে জানিস তো? তুই কিছুই পড়াশোনা করিস না—স্রেফ আড্ডা দিয়ে বেড়াস! এই বলে তোদের বাড়ীতে আমি আজই চিঠি লিখে দেবো।

উঠে বসলো পশুপতি। চোখ বড় বড় করে বললে, সত্যি লিখবি নাকি? অমন কা—কা—কাজটি করোনি Brother। তাহলে বাবা আমায় তে—তে—তেজ্যপুত্তুর করে ছেড়ে দেবে!

—তাহলে লক্ষ্মী ছেলের মত সুড়সুড় ক'রে সত্যি কথাটা বলে ফ্যালো!

—তবে ব—ব—বলেই ফেলি। আমাদের ক্লাসের ন—ন—নমিতা আজ আমাকে তি—তি—তিনটের ট্রিপে বায়স্কোপ দেখালে।

—একদিনেই ভাব জমিয়ে ফেলেছো?

—তবে আর ম—ম—মজাটা কি! আমি তো জ—জ—জমিনি, জমেছে ন—ন—নমিতা নিজে।

—তার মানে?

একগাল হেসে পশুপতি বললে, জমেছে তো—তো—তোর সঙ্গে।

অবাক হ'য়ে ভানু বললে, আমার সঙ্গে!

—তোর সঙ্গে ভা—ভা—ভাব করিয়ে দিতে হবে। বা—বা—বায়স্কোপের সত্বই তো তাই।

—বটে! তারপর?

—তারপর ম—ম—মধুরেণ সমাপয়েৎ, রে—রে—রেষ্টুরেণ্টে খাওয়া।

—হুঁ! বলে ভানু মালকোচা মেরে ডাম্বল দুটো টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলে ব্যায়াম করার জন্য।

—কিরে! ন—ন—নমিতার সঙ্গে তাহলে ভাব করবি তো?

—বলছো! আচ্ছা—দেখবো চেষ্টা করে।

—এর আবার চে—চে—চেষ্টাটা কি করবি? তুই ভাব করলে—আমি ওর ঘা-ঘা-ঘাড় ভেঙে দু'পাঁচদিন নিঃ-খরচায় সি—সি—সিনেমা দেখি আর রে-রে-রেষ্টুরেণ্টে দিব্যি ম—ম—মজা করে চপ কাটলেট ধ্ব—ধ্ব—ধ্বংস করি! ভাব করা এমন আর কি ক—ক—কঠিন কাজ!

—সে তুই বুঝবি না। আমার এখন 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা' অবস্থা। দু' নৌকয় পা দিয়ে শেষকালে কি ডুববো!

—আবার নৌ—নৌ—নৌকো কোথায় পেলি?

—গ—গ—গঙ্গায়! বলে ভানু ডাম্বল ভাঁজতে সুরু করলে।

সমীর ঘরে ঢুকে আঁতকে উঠলো। বললে, কচ্ছেন কি মশাই—কচ্ছেন কি! শুধু শুধু সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত কচ্ছেন কেন? এখুনি ধড় থেকে হাত দুটো খসে গেলে—একটা বিতি-কিশ্রী কাণ্ড ঘটে যাবে। সরু লিক-লিকে পা দুটো মচকে গেলেই বা ঠেকাবে কে?

ভানু সমীরের কথার উত্তর দিলে না।

বঁধুয়া ঘরে ঢুকে ভানুব দিকে চিঠিখানা এগিয়ে ধরে বললে, বাবু—চিঠি!

ডাম্বল জোড়া রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে ভানু বললে বঁধুয়ার কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব অনুকরণ করে, বাবু—চিঠি! আর চিঠি আনবার সময় পেলে না!

বঁধুয়া চিঠি দিয়ে চলে গেল। ভানু চিঠিখানা পড়ে চেয়ারের ওপর বসে পড়লো।

অরুণের দল হল্লা করতে করতে ঘরে এসে ঢুকলো।

—কিছু মনে করবেন না ভানুবাবু। আপনার হাতের ঐ খামখান' কি কোন—

অরুণের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অজিত বললে, কোন মেয়েছেলের লেখা?

জহর উদাস কণ্ঠে বললে, গ্রাম সম্পর্কে কোন বোন-টোন হবেন বোধ হয়।

ধরা গলায় ভানু বললে, আপনারা আমায় কি পেয়েছেন বলুন তো—? Am I a puppet?

—শুধু শুধু আপনি চটছেন কেন?

—mere joke—তামাসা!

—তামাসারও একটা সময় অসময় আছে। এই চিঠিতে কি আছে জানেন! এতে আছে—আমার মামাবাবু মৃত্যু-শয্যায়! ব'লে ভানু সজল চোখে টেবিলের ওপর মাথা রাখলে।

লজ্জায় আর কারুর মুখে কথাটি ফুটলো না। স্তব্ধ নীরবতায় ঘরখানা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিঝুম হয়ে গেল।

গত সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমরবাবু দেহরক্ষা করেছেন। ভানুর এসে পৌঁছানোর অনিশ্চয়তার জন্য পুরোহিত মহাশয়ের নির্দ্দেশে সমরবাবুর শেষকৃত্য দেবুই পাড়ার লোকের সাহায্যে সম্পন্ন করেছে। দাহ কার্য্য শেষ করে ফিরতে ভোর হ'য়ে গেল।

পাড়ার লোক দেবুকে সময়োচিত সান্ত্বনা দিয়ে যে যার ঘরে চলে গেল—জলযোগ অন্তে। সবাইকে বিদায় দিয়ে দেবু তাঁর প্রভুর ঘরে এসে ঢুকলো। শূন্য খাটের দিকে চেয়ে দু'চোখ তার জলে ভেসে গেল। দু' হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজে ঘরের মেঝেয় বসে দেবু ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কতক্ষণ পরে কে জানে—হঠাৎ যেন দেবুর কানে গেল, দেবুদা!

সে যেমন মুখ গুঁজে বসেছিল—তেমনি বসেই রইলো।

—দেবুদা! আমি এসেছি।

দেবু মুখ তুলে দেখলে—সুটকেশ হাতে নিয়ে ভানু তার সামনে দাঁড়িয়ে। দেবু উঠে দু'হাত দিয়ে ভানুকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, দাদাবাবু! বাবু আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

নিজেকে কিছুতেই ভাঙতে দিলে না ভানু। তাকে কাতর হ'তে দেখলে দেবু আরো বেশী ভেঙে পড়বে, কিছুতেই ওকে সামলানো যাবে না। এ ক্ষেত্রে জোর ক'রে মনকে দৃঢ় করতে হবে—, অন্ততঃ বাহ্যিক সেই অভিনয়ই করতে হবে দেবুর কাছে।

যথাসম্ভব গলাটাকে স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক করে নিয়ে ভানু বললে, তুমি কাঁদছো কেন মেয়েছেলের মত। বয়স হয়েছে মারা গেছেন। এতে কাঁদবার কি আছে! চুপ কর, দেবুদা!

—সেই এলে দাদাবাবু, একটা দিন আগে এলে বাবুর সঙ্গে চোখের দেখাটাও হতো।

—বরাতে নেই তাই দেখা হলো না। শুধু শুধু দুঃখ করে দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কি!

চোখের জল মুছতে মুছতে দেবু বললো, মরবার সময় তোমার নাম ধরে কত ডাকাডাকি করলেন! আমি বললুম, আপনার কি খুব কষ্ট হ'চ্ছে বাবু? বাবু বললেন—আমি এখন মরব না দেবু—মরা আমার কিছুতেই হবে না। বাকি কাজটুকু আমায় সেরে যেতেই হবে। আমি জোর করে বাঁচবো! এই ব'লে একটা ঝাঁকানি দিলেন—ব্যস সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।

কথা শেষ করে মুখে গামছা চাপা দিয়ে দেবু আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করলে।

—তোমার চেয়ে আমার দুঃখটা কম নয়, দেবুদা! তোমারি মত তিনি আমায় কোলে পিঠে করে নিজের হাতে ছেলের মত মানুষ করেছেন—সেটা ভুলে যাচ্ছো কেন!

—এই যে বাবাজী! কখন এলে?

ভানু পিছন ফিরে দেখলে—সকন্যা নবদ্বীপবাবু একেবারে ঘরের দরজায়। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, একবারে অন্দরমহলে !

দেঁতো হাসি হেসে নবদ্বীপবাবু বললে, মেয়েছেলের বালাই তো এ বাড়ীতে নেই, তাই সদর দরজা খোলা পেয়ে অন্দর মহলেই ঢুকে পড়লুম। আর ক'দিন পরে চার হাত এক হ'য়ে গেলে—এই অন্দর মহলে পুঁটুরাণীই তো ঢুকবে। তোমার মামাবাবু বেঁচে থাকলে ব্যাপারটা—মানে বিয়ের ব্যাপারটা সুখেরও হতে পারতো—দুঃখের হলেও বলবার কিছুই থাকতো না। সব কিছুই নির্ভর করতো তাঁর মতামতের ওপর। তার চেয়ে গেছেন—গেছেন—ভালই গেছেন, তোমাদের চার হাত এক হবার অন্তরায় ব'লে কিছুই রইলো না। এ একরকম বেশ—মানে ভালই হলো।

দাঁতে দাঁত চেপে ভানু বললে, হুঁ—তাতো বটেই !

—কেমন আছো ভানুদা! পুঁটুরাণীর নাকিসুরের ন্যাকামি ভানুর গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিলে।

রূঢ় কথা কি যেন বলতে গিয়ে সামলে নিলে নিজেকে। চোখ দুটো পিট পিট করে টেনে টেনে বললে, তোমাদের আসার আগে পর্য্যন্ত ভালই ছিলাম। এখন একটু—

—তোমার শরীরটা কি খুব খারাপ বাবাজী ?

—আগে ছিল না—এখন হলো।

ও কিছু না—পথশ্রম। তা যাক্ গে—বলছিলুম কি বাবাজী, তোমাদের চার হাত এক হবার ব্যাপারটা তাহ'লে কবে হচ্ছে—তার আজই একটা ফয়শালা হ'য়ে গেলে হতো না ?

—হলেই তো ফুরিয়ে গেল। মামাবাবুর শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটুক। চার হাত এক তো হ'য়েই আছে। আচ্ছা, তাহলে—

—হ্যাঁ, আমরা তাহলে আসি। আয় মা পুঁটুরাণী, তোর ভানুদা একটু জিরুক। বলে মেয়ের হাত ধরে নবদ্বীপবাবু ফিক করে অর্থহীন হাসি হাসলেন।

দেবু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। ইচ্ছা করে একটি কথাও বলেনি। এইবার

যথাসম্ভব কণ্ঠকে মোলায়ম করে সবিনয়ে দেবু বললে, কাল শ্মশানে যাবার তো সময় হয়ে উঠলো না, কিন্তু বাবুর শ্রাদ্ধে মেয়েকে নিয়ে আসতে যেন ভুল না হয়।

—কেমন করে শ্মশানে যাই বল! পুঁটুরাণীর মায়ের যে আর ক'মাস পরে ছেলে হবে। কিন্তু শ্রাদ্ধে খেতে আসতে তো কোন বাধা নেই। আসবে বৈ কি পুঁটুরাণী তার মামাশ্বশুরের শ্রাদ্ধে দু'খানা লুচি খেতে! ও না খেলে—খাবে কে? ওই তো খাবার মালিক। আর আমি? আরে আমার আসা ছাড়ায় কে? বলে, বিশ্রী নক্কারজনক হাসি হাসতে হাসতে পুঁটুরাণীকে নিয়ে নবদ্বীপপা চলে গেল।

শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে গেল। কলেজ কামাই করে আর বেশী দিন বাড়ী ব থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। সব কিছু বেচে কিনে—দেনা-পাওনা মিট-মাট ক দেবুকে তার নিজের দেশে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলে ভানু। দেবু কিন্তু রাজি নয়। কবে—কোন যুগে সে বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে। বাড়ীর কথা ভাল করে মনেও নেই। তাছাড়া—বাড়ীতে তার আছেই বা কে! বাপ, মা কবে মরে গেছে। তাদের মুখও আর মনে পড়ে না দেবুর। কোথায় সে যাবে ভানুকে ছেড়ে থাকাও তার পক্ষে কষ্টকর। সঠিকভাবে কোন কিছুরই মীমাং হলো না। নাই হোক, ভানু কিন্তু আর দেরী করতে পারে না। আজই তাকে কলেজে ফিরে যেতে হবে।

সমরবাবুর বন্ধুস্থানীয় পাড়ার দু'চার জন প্রবীন লোক সেদিন সকালে এসে ভানুর বিদায় বেলায় সহানুভূতি জানাতে। হোক তা মৌখিক, তবু তার মূল্য আছে। নির্বান্ধব দুনিয়ায় মৌখিক সহানুভূতিই হচ্ছে মানুষের চলার পথে পাথেয়।

—সমরবাবু ছিলেন অতি সৎ লোক। কারো সাতেও নেই—পাঁচেও নেই নিজের কাজের নেশাতেই মসগুল। পল্লীগ্রামে থেকেও তিনি এখানকার স কিছু কুসংস্কার এড়িয়ে গেছেন। এখানকার আবহাওয়া তাঁর অন্তরকে স্পর্শ কে

...তে করতে পারেনি। এ হেন গুণী লোকের শেষ কাজ যে বিনা বাধায় ভাল ...বেই সম্পন্ন হবে,—এ আমরা আগেই জানতাম।

ছলছল চোখে ভানু বললে, লেবরেটরী নিয়েই মামাবাবু ছিলেন পাগল। ...ার হাজার টাকা—যা কিছু তিনি জীবনে উপার্জ্জন করেছেন—সবই ব্যয় ...েছেন গবেষণার কাজে। আমি শুধু উপলক্ষ্য মাত্র, মামাবাবুর শেষ কাজ ...ই করেছে।

—মাঝে মাঝে চিঠি পত্র দিয়ে বুড়োদের খোঁজ খবরটা নিয়ো। আশীর্ব্বাদ ...—মানুষের মত মানুষ হও। আচ্ছা আমরা এখন আসি বাবা! বলে গ্রামের ...তি পতিতপাবনবাবু সদলে স্থান তাগ করলেন।

জামা কাপড় পরতে পরতে ভানু বললে, তাহলে দেবুদা—এবার একটা রিক্সা ...কো! ওকি—আবার চোখে জল! তুমি চোখের জল ফেলে যাবার সময় ...মার অমঙ্গল করবে!

—কি যে বল, দাদাবাবু! চোখে কি যেন একটা পড়লো—

—এই যে বাবাজী! নবদ্বীপবাবু সকন্যা এসে হাজির।

—কি আপদ! কতকটা যেন নিজের মনেই বললে দেবু।

নবদ্বীপবাবু বললে, আপদবালাই যা ছিল—তা তো চুকেই গেছে। ভালোয় ...লোয় ছাদ্দো-শান্তিও মিটে গেল। পেটপুরে বাপ বেটীতে খেয়েও গেলুম খুব— ...কি বলিস পুঁটু?

—আমি তো রাজভোগ কখনো খাইনি। ভানুদার ছাদ্দের দিন—

—ধেৎ পাগলি! ভানুদার ছাদ্দো নয়—বল ভানুদার মামার ছাদ্দো। ...শোধন করে দিলে নবদ্বীপবাবু।

খেঁকিয়ে উঠলো পুঁটু। বললে, হলো—হলো—ঐ হলো। হ্যাঁ তা বলছিলুম ...—সেদিন আমি সাড়ে তিনটে রাজভোগ খেয়েছি। আধখানা আর কিছুতে ...টে ধরলো না, গলা দিয়ে নামলোও না। ভাবলুম—নষ্ট হবে এমন ভাল ...িনিষ! শেষকালে কুকুর, মেথরে খাবে—তাইতো ছাঁদা বেঁধে আধখানা ...জভোগ নিয়ে গেলুম মায়ের জন্যে।

—বিয়ের সময় যত ইচ্ছে পেট ভরে রাজভোগ খাস! রাখ—ও সব বাজে কথা! তাহলে বলছিলুম কি বাবাজী—এইবার তোমাদের—

—এইবার আমাদের সব বিক্রী-সিক্রী করে দেবুদাই আপনার ভাড়ার টাকা চুকিয়ে দেবে।

নবদ্বীপবাবু সবিনয়ে জিব কাটলে। বললে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি বলছো বাবাজী! অত ছোট মন আমার নয়। তোমার কাছ থেকে—মানে জামায়ের কাছ থেকে আমি কিনা ভাড়ার টাকা নোবো! আরে রাম কহ—সে টাকা আমার কাছে গো-রক্ত, ব্রহ্ম-রক্ত। আমি আজ সাত তাড়াতাড়ি এসেছি—তোমাদের দুটির চার হাত এক করে দিয়ে—

—এখুনি! কিন্তু এখন তো আমার সময় হবে না।

—বিয়ে করতে সময় নেই! অবাক হ'য়ে বললে নবদ্বীপবাবু।

—এই সকাল বেলা—মানে মাত্র এককাপ চা খেয়ে বেরুচ্ছি। এক্ষুনি কেমন করে—

—ওঃ হোঃ এখুনি মানে কিছুদিন পরে—এই আর কি!

—ঠিক আছে। এম, এ-টা পাস করে আসি। ব'লে ভানু যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

নবদ্বীপবাবু বললে, ও আর ক'দিন লাগবে তোমার মত হীরের টুকরে ছেলের! ধরবে আর টপাটপ পাস করে ফেলবে—না কি বলিস পুঁটুরাণী?

—কটা পাস তোমায় করতে হবে, ভানুদা?

—বেশী নয়—মাত্তোর দুটো। ভানু যাবার জন্য পা বাড়ালে।

পুঁটুরাণী বললে, সে যে অনেক দিন লাগবে।

—এমন আর কি বেশী দিন। দু' দুগুনে চার বছর—দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আচ্ছা দেবুদা চলি। বলে ভানু সুটকেশ হাতে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

—যাবার সময় তোর ভানুদাকে একটা পেন্নাম করলি না! কি বোকা মেয়ে তুই!

—বোকা আমি—না তুমি! ভানুদা কি ব'লে গেল—মানেটা তার তলিয়ে বুঝলে? চার-চার বছর পরে উনি আমাকে বিয়ে করবেন! ঠাট্টা! ঠাট্টা! বাড়ী বয়ে এসেছি বলে অপমান করে গেল। মানে—সাত মণ তেলও পুড়বে না আর রাধাও নাচবে না। বুঝেছো—! ব'লে পুঁটুরাণী রোষভরে একাই ঠর-ঠর করে চলে গেল।

দেবুর দিকে চেয়ে নবদ্বীপবাবু বললে, হুঁ—তোমাদের পেটে পেটে সব বিষের ছুরি! মেয়েটাকে ভাগ্যিস দু'কলম লেখাপড়া শিখিয়েছিলুম তাই তো তোমাদের চালাকিটা হাতে হাতে ধরে ফেললে। উঃ আমাকে একবারে রাম-ধাপ্পা দিয়ে চলে গেল! শেষ কথা বলে যাচ্ছি বিয়ে যখন হবেই না তখন আর খাতির কিসের! পনের দিনের মধ্যে ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিয়ে বাড়ী ছেড়ে উঠে যাবে। নইলে কি করি—পনের দিন পরে টেরটা পাবে—আমার নাম—নবদ্বীপ!

আজ একটু সকাল সকালই ক্লাস শেষ হয়ে গেল। ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ জোরেই বৃষ্টি নামলো। অন্য দিনের তুলনায় তাই common room এ আজ এত ভীড়। কেউ পড়ছে, কেউ সহপাঠীর কাছ থেকে অঙ্ক বুঝিয়ে নিচ্ছে। কেউবা করছে প্রফেসরদের পড়ানোর সমালোচনা। পল্লীর গো-হাটা এর চেয়ে তুলনায় ভাল কি মন্দ—তা বলা একটু কষ্টকর।

ভানুর সঙ্গে সাবিত্রী এসে অপেক্ষাকৃত নিরালা একটা কোণ বেছে নিয়েছে। হট্টগোলের মধ্যে তাদের সুবিধাই হয়েছে আলাপ আলোচনার। দু'জনের মধ্যে ক'দিন দেখা নেই। এ ক'দিন সাবিত্রীর একা একা বড়ই অস্বস্তিতে কেটেছে। পরস্পর পরস্পরের কাছে বলবার জন্য মনের কোণে অনেক কথাই জমাট বেঁধে রয়েছে। মন খালি করতে না পারলে—স্বস্তি নেই।

পুঁটুরাণী আর তার বাবার ইতিহাস শুনে সাবিত্রী হেসেই খুন। এযুগে এমন মানুষও আছে! যেমন বাবা—তেমনি মেয়ে, দু'টি দু'রকমের অভিনব চরিত্র।

—আপনার পুঁটুরাণীর গল্প শুনে কি মনে হ'লো জানেন? বলে সাবিত্রী স্মিতহাস্যে ভানুর মুখের দিকে চাইলে।

—বলুন।

—মেয়েটি আপনাকে ভয়ানক ভালবেসে ফেলেছে।

এরকম মন্তব্যের জন্য ভানু মোটেই প্রস্তুত ছিল না। জিনিষটা হালকা করে নিয়ে ভানু বললে, অতএব—?

—শুভস্য শীঘ্রম। একটা ভাল দিন দেখে চট্‌পট্ চার হাত এক করে ফেলুন।

সহাস্যে ভানু বললে, কথাটা নেহাৎ মন্দ বলেননি। তবে পালিয়ে না এলে—বোধ হয় ধরে বেঁধে গাঁটছড়া বাঁধিয়ে ছাড়তো। বাপ্, যাকে বলে গেছো মেয়ে! একবারে নাছোড়বান্দা।

নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ভানুর দিকে একবার আড় চোখে চেয়ে নিলে সাবিত্রী। ভানুর মনের ভাবটা বোঝবার চেষ্টা করে সাবিত্রী বললে, আর আপনি?

—আমি? 'কমলি তো হাম ছোড় দিয়া লেকেন, কমলি হামকো নেহি ছোড়তা!'

—তার মানে?

—বিয়ের পণ বাঁচাতে পুঁটুরাণী হ'তে চান স্বয়ম্বরা আর মক্কেল পাকড়েছেন এই অধমতারণ শ্রীমান ভানুকে।

সাবিত্রী বললে, দেখুন—যাচা অন্ন ছাড়তে নেই!

—যাচা অন্ন খেতেও নেই, তাতে অজীর্ণ হয়। ও একটা অখাদ্য!

ভানুর কথায় সাবিত্রী চাপাহাসি হাসলে। সে হাসি অরুণের দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

—ব্যাটার জমাবার capacity—মাইরি অদ্ভুত!

অজিত বন্ধুর কথার প্রতিবাদ করলে। বললে, ভানুর তো আমি বিশেষ দোষ দেখি না। সাবিত্রীই তো ওর আশ-পাশে ঘুর-ঘুর ক'রে ঘুরে বেড়ায়। গায়ে পড়ে জমান আলাপ ঘনীভূত ক'রে তুলতে চায়।

—যা বলেছিস। এটা বুঝিয়ে দিন—ওটা বুঝিয়ে দিন ক'রে ভানুর গা ঘেঁসে গিয়ে বসে যখন তখন।

জহর চিনেবাদাম ভেঙে খাচ্ছিল। একটা বাদাম মুখে দিয়ে বললে, আরে বাবা—আমরা না হয় universityতে firstই হতে পারিনি, তা বলে আমরা কি কিছু কম বুঝি!

—কিন্তু এমনি আমাদের পোড়া বরাত যে—কোন দিনের জন্যে সাবিত্রী এসে আমাদের কাছে কোন কিছু বুঝে নিতে চাইলে না। ব'লে অনুপ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে।

—ওদিকে আবার নজর দিচ্ছো কেন, বাবা। আমাকে দেখেও শিক্ষা হচ্ছে না! নে—তার চেয়ে বাদাম ভাজা খা। বলে জহর ঠোঙ্গা থেকে চাড্ডি খোসাশুদ্ধ বাদাম নিয়ে অনুপের হাতে দিলে।

নমিতা হন হন করে এসে জহরকে বললে, আপনাদের কারুর ছাতা আছে?

থতিয়ে গেল জহর। ছাতা তার বা তার দলের কারোর নেই। অথচ এ হেন সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে মাত্র একটা ছাতা থাকলেই আলাপটা জমে যায়। গায়ে পড়ে—এতো আর শুধু শুধু আলাপ জমাতে চেষ্টা করা নয়। হঠাৎ তার লক্ষ্য পড়লো ভানুর ছাতাটার ওপর। নমিতার মুখের দিকে চেয়ে বললে, ছাতা! হ্যাঁ—আছে। তাইতো—আমার ছাতাটা! ঐ যে—ওখানে আবার কে রাখলে?

জহর চুপিসাড়ে গিয়ে ভানুর অলক্ষ্যে তার ছাতাটা নিয়ে এসে নমিতার হাতে দিলে। ছাতা নিয়ে হাসিমুখে নমিতা বললে, ধন্যবাদ!

—বৃষ্টিতে ভিজে না গিয়ে একটু বসে গেলেই পারতেন।

—বাড়ীতে একটা জরুরী কাজ আছে।

অরুণ অতি বড় ঘনিষ্ঠের মত বললে, জলে আটকে গেছি ব'লে বাড়ীতে টেলিফোন করে দিন।

—কিছু দরকার নেই। Bus stand পর্য্যন্ত গেলেই তো—বাকি কথা হাসি দিয়ে সমাপ্ত করলে নমিতা। জহরের দিকে চেয়ে বললে, কাল কলেজে আসবার সময় ছাতাটা নিয়ে আসবো। খু-ব অসুবিধা হ'বে না তো? অজিত

দাঁড়িয়ে উঠে বললে, কি দরকার আপনার অত কষ্ট করবার। তার চেয়ে চলুন—আমি আপনার মাথায় ছাতা ধরে Bus-stand পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসি।

গমনোদ্যতা নমিতা অজিতের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে স্মিত হাস্যে বললে, নিজের মাথায় আমি নিজেই ছাতা ধরতে পারবো—ধন্যবাদ!

নমিতা যেতে যেতে উৎসুক নয়নে বার বার চেয়ে দেখতে লাগলো ভানু আর সাবিত্রীকে।

জহর চাপা গলায় বললে, কেমন—হলো তো!

—ওটা কিছুতেই আমায় পাত্তা দিতে চায় না—কেন বলতো? কথা বলা তো দূরের কথা—দেখলেই কেমন চটে যায়!

অরুণ কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, বরাত!

সাবিত্রী চলে গেল। ভানুর হঠাৎ ছাতার কথা মনে পড়লো। ছাতা খুঁজতে খুঁজতে সে অরুণদের দলের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

অরুণ বললে, কাকে খুঁজছেন?

জহর জুগিয়ে দিলে, সাবিত্রী তো এইমাত্র চলে গেল!

—আমি খুঁজছি আমার ছাতা—সাবিত্রীকে নয়।

অজিত সহানুভূতির সুরে বললে, আহা—ছাতাটা তা'হলে গেল!

অনুপ বললে, আমার বোধ হয়—সাবিত্রী নিয়ে গেছে।

—তাই যদি হয়—তাহলে চিন্তার কি আছে?

পাপু টেবিলের ওপর থেকে মাথা না তুলেই বললে, না বলিয়া পরের জিনিস লইলে চুরি করা হয়।

—সাবিত্রী কি ওঁর পর! বলে অরুণ ভানুর মুখের দিকে চাইলে।

—তা কেন হবে! সাবিত্রী আমার সাত পাকের ইয়ে—বলে ভানু অন্য দিকে চলে যাচ্ছিল।

ভানুর কথা বলার ধরণে সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো।

—ভানুবাবু! শুনুন। নমিতাকে আমি কিন্তু একটা ছাতা নিয়ে যেতে দেখেছি।

—নমিতা! কে নমিতা?

—কি সর্ব্বনাশ! নমিতাকে চেনেন না। আপনার—মানে আমাদের সাবিত্রীর মাসতুতো বোন!

বলে অর্থহীন হাসি হাসলে জহর।

—তা সে মাসতুতো বোনই হোক মাসীই হোক—আমাকে না বলে আমার ছাতা নিয়ে গেল কোন অধিকারে?

—অধিকার নেই, তবে অধিকার খুঁজছে।

—কিসের অধিকার?

—ঘনিষ্ঠ হবার। বুঝছেন না—ভাব জমাবার এ একটা নতুন ফিকির।

—ছেলেধরা মশাই—এক নম্বরের ছেলেধরা। নমিতার তো আর কলেজ করতে আসা নয়—ছেলে ধরতে আসা!

—যাকে সোজা কথায় বলে—বিয়ের পণ বাঁচানো কারবার!

হতাশ হয়ে ভানু বসে পড়ে বললে, তাহলে ছাতাটা আমার গেল!

বিজ্ঞের হাসি হেসে জহর বললে, ইচ্ছে ক'রে যদি যেতে দেন তো আর আমরা কি করতে পারি! নইলে আমি নমিতাদের বাড়ী চিনি, এখুনি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ছাতা আদায় করে আনতে পারি!

—জল তো থেমে গেছে। চলুন তো যাই! ব'লে ভানু উঠে দাঁড়াল।

—চলুন! বলে ভানুকে সঙ্গে নিয়ে জহর চলে গেল।

শ্যামবাবুর বাড়ী। অর্থাৎ সাবিত্রীর মেসোমশাইয়ের—অর্থাৎ নমিতার বাবার বাড়ী। একটু সেকেলে ধরণের বাড়ী। ভদ্রলোক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকরে। বর্ত্তমানে অবৈতনিক হস্ত-রেখা-বিশারদ।

নমিতা দরজার কড়া নাড়লে। নমিতার মা রাজলক্ষ্মী এসে দরজাটা খুলে দিলে।

—এত দেরী হলো? জলের জন্যে আটকা পড়েছিলি বুঝি?

ভিতরে ঢুকে ছাতাটা খুলতে খুলতে নমিতা বললে, কতক্ষণ আটকা পড়ে থাকবো? তাইতো ছাতাটা চেয়ে আনলুম।

—ওমা, এ যে ব্যাটাছেলের ছাতা।

নমিতা ছাতার ওপর ভানুর নাম লেখা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। জহর ভানুর ছাতাটাকে নিজের বলে চাল মেরে চালিয়ে দিলে! কি অদ্ভুত ছেলে!

—কার ছাতা? রাজলক্ষীর প্রশ্নে নমিতার চমক ভাঙলো।

—ভানুবাবুর।

—ওঃ যে ছেলেটি first হয়েছে? তা তাকে একদিন আনতে পারলি না আমাদের বাড়ীতে!

মনের ইচ্ছা গোপন করে তাচ্ছিল্যভরে নমিতা বললে, কি হবে এনে! শুধু শুধু চা বিস্কুট ধ্বংস।

—ছেলেমানুষ—কিছুতো বুঝিস না। জামাই করতে হয় তো ঐ রকম ছেলে। যাও মুখ হাত ধুয়ে জলখাবার খাওগে। বলে দরজায় খিল দিয়ে রাজলক্ষী ড্রইংরুমে গিয়ে ঢুকলেন।

শ্যামবাবুর বাড়ীর সামনে এসে জহর বললে, এই বাড়ী! আপনি এই গ্যাসপোষ্টের তলায় একটু দাঁড়ান—আমি আপনার ছাতাটা চেয়ে আনছি।

—বেশী দেরী করবেন না যেন!

—ক্ষেপেছেন! বলে জহর এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লে।

রাজলক্ষী দরজা খুলতে খুলতে ভিতর থেকে বলছেন, আবার কে এলো রে বাবু!

দরজা খুলে জহরকে দেখে বললেন, ওমা—এ আবার কে!

—আজ্ঞে, নমিতা একটা ছাতা—

জহরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রাজলক্ষী একগাল হেসে বললেন, ওঃ ছাতা। এসো বাবা—ভেতরে এসো! ছাতা নিতে তুমি আসবে—একথা আমি আগেই জানতাম। লজ্জা কি বাবা—ভেতরে এসো! এইমাত্র নমি তোমার নাম কচ্ছিল।

ছাতার কথা শুনেই তিনি ছাতার অধিকারী ভানু ভেবে নিলেন। কয়েক

মুহূর্ত্ত আগে তিনি নমিতার কাছে শুনেছেন যে ছাতাটা ভানুর। জহর কিন্তু এই ভুল বোঝাবুঝির কিছুই বুঝলে না। রাজলক্ষ্মী তাকে first boy ভানু হিসাবে একরকম টেনেই বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন। বেচারা ভানুর চোখের সামনে সাবিত্রীদের বাড়ীর দরজায় খিল পড়ে গেল। বিহ্বল নেত্রে সে শুধু একবার বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে দেখলে।

সাবিত্রী এসে বাড়ীর দরজার কড়া নাড়তে যাচ্ছিল—লক্ষ্যও পড়লো ভানুর ওপর। ভানু ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উদাস নয়নে চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে? পিছন থেকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সাবিত্রী।

—নমিতা আমার ছাতাটা—মানে ভুলে নিয়ে এসেছে। তাই নিতে এসেছি।

—তা এরকম করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসুন—আসুন,—ভেতরে আসুন। বলে সাবিত্রী গিয়ে দরজার কড়া নাড়লে।

দরজা খুলে দিলেন নমিতার বাবা শ্যামবাবু।

সাবিত্রী হেসে বললে,—আপনি কেন দরজা খুলতে এলেন মেসোমসাই? চাকরটা কোথায় গেল?

—আজ দুপুর থেকে কম্প দিয়ে তার ভীষণ জ্বর এসেছে। বেচারার ওঠবার ক্ষমতা নেই। সঙ্গের ঐ ভদ্রলোক—

—ইনিই হচ্ছেন ভানুবাবু। Intermediate examination-এ এবছর Universityতে first হয়েছেন। আর ইনি হচ্ছেন আমার মেসোমসাই!

ভানু দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, নমস্কার।

শ্যামবাবু প্রতিনমস্কার করে স্বচ্ছ কণ্ঠে বললেন, এসো বাবা। সাবিত্রীর মুখে আমরা তোমার অনেক কথাই শুনেছি। ভেতরে এসো।

দরজা বন্ধ করে শ্যামবাবু ওদের ভিতবে নিয়ে এলেন।

ওদিকে তখন ড্রইংরুমে বসে জহরকে মহা সমাদরে ভানু-জ্ঞানে রাজলক্ষ্মী চা-পানে আপ্যায়িত করতে করতে গল্প কচ্ছেন।

—নমি তো বাবা তোমার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। প্রশংসা করবে নাই বা কেন—কত বড় গুণের ছেলে তুমি। যাকে বলে হীরের টুকরো!

নমিতা একটা ডিসে ডিমের মামলেট নিয়ে ঢুকলো।

রাজলক্ষ্মী বললে সসব্যস্তে, এনেছো মা—দাও।

—না—না আর দেবেন না। খাতিরের আতিশয্যে জহরের চোখে মুখে বিস্ময় যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

রাজলক্ষ্মী এক গাল হেসে বললেন, তাতে কি হয় বাবা। নমি তোমার জন্যে নিজের হাতে ভেজে এনেছে, না খেলে কি চলে! হাত-টাত পোড়াসনি তো মা?

শুধু শুধু জহরকে এত খাতির বরদাস্ত করতে পাচ্ছিল না নমিতা, অথচ সামনাসামনি কোন কিছু বলবারও উপায় নেই। মায়ের আদেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে মামলেট ভেজে আনতে হয়েছে। যাবার সময় সংক্ষেপে শুধু সে বলে গেল, হ্যাঁ—ভারি তো কাজ!

—আর খেলে হোষ্টেলে ফিরে খেতে পারবো না। বলে জহর মামলেটের ডিসটা ঠেলে রাখলে।

রাজলক্ষ্মী মামলেটের ডিসটা জহরের সামনে ধরে দিয়ে বললেন, বয়সের ছেলে—খেতে পারব না বললে কি চলে! ঠিক মত না খেলে শরীর যে ভেঙে পড়বে—খেটে পড়াশুনা করতে পারবে কেন! আমি কোন কথা শুনবো না—ও মামলেটটা তোমায় খেতেই হবে। এক কাপ চা করে নিয়ে এসো তো মা! নমিতার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন রাজলক্ষ্মী।

—চা খাওয়া আমার অভ্যাস নেই।

—একদিনেই কি আর অভ্যেস হয় বাবা! খেতে খেতেই অভ্যেস হয়।

—এই ত্থাখো—কাকে ধরে এনেছি ত্থাখো! বলতে বলতে ভানুকে নিয়ে শ্যামবাবু এসে ড্রইংরুমে ঢুকলেন।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জহর বললে, আরে ভানুবাবু! আমি তো মশাই আপনার কথা ভুলেই গেছলাম।

ভানু বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললে, অশেষ ধন্যবাদ।

—ভানু! ভানুবাবু! রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট।

—হ্যাঁ—ইনিই ভানুবাবু। মানে এ বছরে first হয়েছেন—first! বসো বাবা—বসো। ব'লে তিনি নিজেই একটা সোফায় বসে পড়লেন।

—ইনি কে? শ্যামবাবু জিজ্ঞেস করলেন রাজলক্ষ্মীকে।

—কে জানে! তিক্তকণ্ঠে বললেন রাজলক্ষ্মী।

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বললে, ইনি আমাদের সঙ্গে পড়েন।

রাজলক্ষ্মী নিজের আসন ছেড়ে ভানুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার আপাদ-মস্তক দেখে বললেন, কি সব্বোনাশ! তুমিই ভানু—মানে এ বছর first হয়েছো? আমি মনে করেছি—(জহরের দিকে চেয়ে) তুমি যে ভানু নও—একথা কি ছাই—আগে জানতাম!

—ও হোঃ হোঃ—তুমি বুঝি একেই ভানুবাবু ঠাউরেছিলে! শ্যামবাবু শুধু একটু হাসলেন।

—বসো বাবা—ভালো হ'য়ে বসো! ব'লে রাজলক্ষ্মী জহরের সামনে থেকে মামলেটের ডিসটা খপ করে তুলে নিয়ে ভানুর সামনে ধরে দিলে।

—আমি—মানে এসব—!

—না বাবা—একটু চা না খাইয়ে তোমায় আমি ছাড়ছি না। ব'লে তিনি ভানুর প্রায় পাশে এসে বসলেন।

নমিতা চায়ের কাপ নিয়ে এসে জহরের টিপয়ের সামনে রাখলে। রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি কাপটা তুলে নিয়ে ভানুর সামনে ধরে দিয়ে নমিতাকে বললে, তোমার ভানুদার জন্যে খানকয়েক পাঁপর ভেজে নিয়ে এসো তো মা!

নমিতা সানন্দে পাঁপর ভাজতে চলে গেল।

—আচ্ছা—আপনার ছাতাটা তাহলে আপনিই নিয়ে যাবেন ভানুবাবু। আমি উঠলাম। ব'লে জহর গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল।

—এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? একটু দাঁড়ান—এক সঙ্গে যাবো। ব'লে ভানু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলে।

—না বাবা, তোমার যেতে একটু দেরীই হবে। অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন সাবি! ভদ্দোর লোকের ছেলেকে দরজাটা দেখিয়ে দিতে হবে তো!

—আমি নিজেই দেখে নিতে পারবো। আচ্ছা নমস্কার! ব'লে জহর গট্‌গট্‌ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

জহরের পিছনে পিছনে সাবিত্রীও বেরিয়ে এলো। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বললে, আমার মাসীমার ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না, জহরবাবু। আমি ল হয়ে—

—যথেষ্ট হয়েছে! আপনার মাসীমার ব্যবহার মনে রাখবার ম! নমস্কার! জহর রাগে গস্‌গস্ করতে করতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

—তারপর—ভানুবাবু! ব'লে শ্যামবাবু চুরুটটা মুখে দিয়ে কোন কিছু ভানুর কাছ থেকে শোনবার জন্য তার দিকে চাইলেন।

—আজ্ঞে—'বাবু' কথাটা বাদ দিয়ে শুধু ভানু বলেই আমাকে ডাকবেন। আপনি হচ্ছেন নমিতার বাবা—সাবিত্রীর মেসোমশাই। সম্পর্কে আমা গুরুজন। কেমন ঠিক বলিনি, মাসিমা!

—নিশ্চয় নিশ্চয়! আহা—কি মিষ্টি কথা! ব'লে রাজলক্ষ্মী ভানু দিকে চাইলেন।

নমিতা এক ডিস্ পাঁপর এনে ভানুর সামনে রাখলে। মুখে তার বিরক্তি লেশমাত্র নেই, মনটা বেশ প্রসন্ন। রাজলক্ষ্মী মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, বে ভাল করে আর এক কাপ কোকো! ব'লে রাজলক্ষ্মী শ্যামবাবুর দিকে চাইলেন তুমি খাবে নাকি? তাহলে মা···দু কাপ।

—হ্যাঁ মা—বেশ কড়া করে।

ভানু বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললে, এক সঙ্গে চা আবার কোকো!

—তুমি জানো না বাবা—নমি খুব ভাল কোকো তৈরী করতে পারে! ছাড়া—তুমি খাবে—

—সেই জন্যে আজ খু—ব খারাপ ক'রে তৈরী করবো। ব'লে চপল হাসি হাসতে হাসতে নমিতা চলে গেল।

—শুনেছো পাগলির কথা! ভারি আমুদে। তোমার কথা প্রায়ই বলে কি গো—তাই নয়? রাজলক্ষ্মী কথার পৃষ্ঠে সাক্ষী মানলেন শ্যামবাবুকে।

ভানুর কথা প্রায়ই নমিতাকে বলতে শুনুন বা নাই শুনুন—গৃহিণীকে সমর্থন তাঁকে করতেই হয়। খবরের কাগজ থেকে মুখ না নামিয়েই তিনি বল্লেন, হ্যাঁ—তা বলে—প্রায়ই বলে।

—নমি ইংরেজিটায় একটু কাঁচা। মাঝে মাঝে এসে—অবশ্য সময় পেলে—ওকে ইংরিজিটা একটু যদি—কথা অসমাপ্ত রেখে রাজলক্ষ্মী ভানুর মুখের দিকে চাইলেন।

—পড়াবার কথা বলছেন তো! তা—তা—সময় পেলে আসবো বইকি। এ অতি আনন্দের কথা! আচ্ছা—কৈ—সাবিত্রীকে দেখছিনা তো?

ভানুর মুখে নমিতার নামটাই শুনতে ভাল লাগে রাজলক্ষ্মীর, তা নয় সাবিত্রীর খোঁজ! উদাস কণ্ঠে রাজলক্ষ্মী বললেন, কে জানে কোথা আছে! দিন রাত্তির শুধু বই মুখে দিয়েই আছে—সংসারের কুটিটি পর্য্যন্ত নাড়ে না। আর নমি—? বললে না বিশ্বাস করবে বাবা, যেমন পড়াশোনায়, তেমনি কাজকম্মে! তা ছাড়া ওর একটা মস্ত গুণ—গুণের কদর ও বোঝে। তাই তো নমি ভানুদা বলতে অজ্ঞান!

নমিতা দু'কাপ কোকো নিয়ে এলো।

—বেশ ভাল করে করেছিস তো?

—বেশ কড়া করে ক'রেছো তো! ব'লে শ্যামবাবু হাসিহাসি মুখে কন্যার দিকে চাইলেন।

সোফার হ্যাণ্ডের ওপর বসে নমিতা বললে, ভাল হ'য়েছে কি খারাপ হয়েছে—এক চুমুক কবে খেলেই বোঝা যাবে।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য যাবে। এ ছাড়া ভানুর বলবার আর কি-ই বা আছে।

—দেখুন না খেয়ে এক চুমুক! ভানুর দিকে চেয়ে সম্মোহন কণ্ঠে বললে নমিতা।

—হ্যাঁ দেখা যাক্—খেয়েই দেখা যাক। ব'লে শ্যামবাবু কোকোর পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

ভানু এক চুমুক খেয়েই মন্তব্য করলে, কোকো তো নয় ঠিক যেন পোড়া

চা। আচ্ছা, কি স্বাদে আপনারা এগুলো খান বলুন তো! অবশ্য কিছু মনে করবেন না। চট্ করে কথাটা মুখ দিয়ে কেমন—

—হাঃ হাঃ হাঃ—এরা সব আমায় ঠাট্টা করে—জানো—কোকো খেতে পারি না ব'লে এরা সব আমায় ঠাট্টা করে। কোকোতে পোড়া চারের গন্ধ আমার শুধু একার লাগে না—তোমারও তাহলে লাগে! আবার তিনি সরস প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগলেন।

—আমারও কিন্তু পোড়া-পোড়া গন্ধ লাগে! বলতে বলতে সাবিত্রী এসে তার মেসোমশাইয়ের পাশে বসলো।

—লাগতেই হবে—লাগতেই হবে—আমার যখন লাগে—তোমার তখন তো-

—হ্যাঁ দেখুন, আজ তাহলে উঠি—রাত হলো। ব'লে ভানু উঠে দাঁড়াল।

—রাতের খাওয়াটা এখানেই খেয়ে গেলে হ'তো না, বাবা! বলতে বলতে রাজলক্ষ্মীও উঠে দাঁড়ালেন।

—দেখুন—ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। ন'টার মধ্যে হোষ্টেলে ফিরতেই হবে। আগে থাকতে তো কিছু বলা নেই।

—কিন্তু আলাপ তো তেমন ভালভাবে জমলো না, ভানুবাবু!

—আজ্ঞে—, ভানুবাবু নয়—ভানু!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভানু! তা—তা—তা—

—আবার কবে মাসীমার বাড়ী আসছো, বাবা? দরদভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন রাজলক্ষ্মী।

—আজ্ঞে—আলাপ যখন হলো—নিজের তাগিদে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে দেরী হবে না। আচ্ছা—আজ আসি! ব'লে দরজার ধার পর্য্যন্ত ভানু এগিয়ে গেল।

রাজলক্ষ্মী পিছনে পিছনে যাচ্ছিল, সাবিত্রী দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আপনার ছাতাটা কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন!

—ওঃ হোঃ হোঃ—ছাতাটা কই? বলে ফিরে দাঁড়াল ভানু।

—আসুন আমার সঙ্গে—দিচ্ছি।

—সে কি কথা! নমি আনলে ছাতা—তুমি কেন দেবে! সেটা তো ভদ্রতা নয়। ছাতা নিজের হাতে দেবে নমি। যাও নমি—তোমার ভানুদাকে ছাতাটা দাও গে! ব'লে রাজলক্ষ্মী এসে নিজের জায়গায় বসলেন।

নমস্কার জানিয়ে নমিতার পিছু পিছু ভানু চলে গেল। যেতে যেতে সবিত্রীর সঙ্গে ভানুর যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হলো—তা কিন্তু রাজলক্ষ্মীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না।

বৈজ্ঞানিক সমরবাবু প্রায় মাসখানেক হলো মারা গেছেন। ভাড়া দেবার পনের দিনের কড়ার যা ছিল—তা শেষ হ'য়ে গিয়ে দু' একদিন বেশীই হ'য়েছে। দেবু সব কিছু মালপত্র বিক্রী করবার জন্য খদ্দের খুঁজছে—খদ্দেরও আসছে, কিন্তু সবাই চায় কড়ায় ঘোড়া কিনতে। দাও মারবার তালে ঘুরছে সবাই। কাজেই নিরুপায় দেবু মালপত্র বিক্রীও করতে পারছে না আর বাড়ীভাড়াও মিটিয়ে দিতে পাচ্ছে না।

আজ তাই ভেবে নবদ্বীপবাবু গুণ্ডা নিয়ে বাড়ী দখল করতে এসেছে। দেবুর কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে গুণ্ডার দল জোর করে বাড়ী থেকে মালপত্র বার করে লরী বোঝাই কচ্ছে।

নবদ্বীপবাবুর দুটি হাত ধরে দেবু সজল চোখে বললে, কাজটা কি ভাল হচ্ছে, নবদ্বীপদা!

এক ঝাকুনি দিয়ে হাত দু'টো সরিয়ে নিয়ে নবদ্বীপবাবু বললে, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। তাই এবার আঙুল বেকিয়ে ঘি তুলছি।

—আগেও বলেছি আর আজও বলছি, ভাড়া তোমার মারবো না। বাবুর যা কিছু আছে—সব বিক্রী করে তোমার ভাড়া আমি মিটিয়ে দেবো! তুমি ওদের বারণ কর, নবদ্বীপদা! কাকুতিভরা কণ্ঠে বললে দেবু!

—ওসব ছেঁদো কথা আমি ঢের শুনেছি। লে—লে—যেখানে যা মালপত্তর আছে—সব টেনে বার কর।

—বিশ্বাস কর—আমি খদ্দের দেখছি।

মালকোঁচা মারতে মারতে নবদ্বীপবাবু বললে, বিশ্বাস আমি করতাম, কিন্তু তোমার দাদাবাবু সেদিন শুধু আমার একার অপমান করেনি—করেছে পুঁটুরাণীর অপমান। বলি—পুঁটুরাণী কি তার ঠাট্টার পাত্রী!

দেবু ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, বিয়ে যখন হবে—ঠাট্টা করলে দোষ কি!

—সামনের ঐ যে তালা বন্ধ ঘরটা দেখছো কর্ত্তা—মালকোড়ি বোধ হয় ওখানেই সরান আছে।

নবদ্বীপবাবু দরাজ কণ্ঠে হুকুম দিলেন, ভাঙ্‌ দরজা।

—দোহাই নবদ্বীপদা! ও ঘরে ঢুকে তোমরা তচ্‌-নচ্‌ করো না! ওটা আমার বাবুর ল্যাবরেটরী, ব'লে ছুটে গিয়ে দেবু ঘরের দরজা দু'হাত দিয়ে আগলে দাঁড়াল।

জোর করে দেবুকে সরিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে গুণ্ডার দল ভেতরে ঢুকলো, সমরবাবুর নিজের হাতে সাজানো ল্যাবরেটরী তারা ভেঙে চুরে মুহূর্ত্তে তচ্‌-নচ্‌ ক'রে দিলে। শিশি বোতল ভেঙে—বইখাতা ছিঁড়ে—ল্যাবরেটরীর সাজ-সরঞ্জাম চুরমার ক'রে—যে কাণ্ড তারা দেবুর চোখের সামনে করলে তা সত্যই মর্ম্মান্তিক। দেবু কেঁদে ফেললে।

—ভাঙ্‌—ভাঙ্‌—ভেঙে সব লণ্ডভণ্ড করে দে! কেমন—এবার ডাকো তোমার দাদাবাবুকে! পুঁটুরাণীকে ঠাট্টা করার প্রতিফলটা নিজের চোখে একবার দেখে যাক। বলে পৈশাচিক হাসি হাসলে নবদ্বীপবাবু।

—নাঃ—এ ঘরে মালকোড়ি কিচ্ছু নেই। শুধু শিশি, বোতল, রবারের নল আর বইখাতা—যত বাজে মাল, তাহলে এবার বাদবাকি ঘরগুলো খুঁজে দেখা যাক—কি বল কর্ত্তা! ব'লে গুণ্ডা সর্দ্দার নবদ্বীপের মুখের দিকে চাইলে।

—ঠিক হ্যায়। আও হামারা সাথ্‌। হিন্দী কথা বলতে বলতে নবদ্বীপবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, গুণ্ডার দল তাকে অনুসরণ করলে।

রাগে, দুঃখে দেবু থর থর করে কাঁপছে, এই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে সে কি শুধু পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। চোখের সামনে দেখবে এই অকথ্য

অত্যাচার, কিন্তু কি সে করবে—কি সে করতে পারে—করার ক্ষমতা তার কতটুকু! উঃ – অসহ্য!

আলমারিটার কাঁচ সব ভেঙে দিয়েছে। ভেতরের ওষুধ—সব টান মেরে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে এক বীভৎস কাণ্ড করেছে। আলমারিটা ক্ষত হ'য়েও দাঁড়িয়ে আছে আর আছে তার ভিতরে একটি শিশি অক্ষত অবস্থায়। শিশির গায়ে কাগজের উপর লেখা—'অদৃশ্য হওনের ঔষধ"।

"নির্দ্ধারিত সময় – "বাকিটুকু ছিঁড়ে গেছে।

দেবুর চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলে উঠলো, বিস্ফারিত চোখে সে এগিয়ে গেল আলমারির ধারে। ভাঙা কাচের ফাঁক দিয়ে সে শিশিটা বার করে আনলে, শুধু হাত নয়—সর্ব শরীর তখন তার থর-থর করে কাঁপছে। শিশিটার তলায় পড়ে আছে মাত্র এক ডোজ ওষুধ।

কোন চিন্তা ভাবনা না করে দেবু ছিপি খুলে ওষুধটা গলায় ঢেলে দিলে। কম্পিত হস্ত থেকে শিশিটা মেঝেয়ে পড়ে মুহূর্ত্তে টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হ'য়ে গেল দেবু। অদৃশ্য দেবুর অট্টহাস্যে সারা বাড়ী কেঁপে উঠলো। অদৃশ্য দেবু সবই দেখছে—সবাইকে দেখছে। কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। অদৃশ্য দেবু ওদের আক্রমণ করলে।

—উঃ গেছিরে বাবা!

—কি হলো?

—পিছন থেকে কে যেন আমার পিঠে ঘুষি মারলে।

—ধেৎ আহাম্মক! জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিস! বক্তার মুখের কথা মুখে রইলো, সে ধড়াস করে মাটিতে পড়ে গোঁয়াতে সুরু করলে।

ঘরের যা কিছু দামী জিনিষ একটা ট্রাঙ্ক ভর্ত্তি করে একটা গুণ্ডার মাথায় চাপিয়ে নবদ্বীপ এসে হাজির।

—কি হলোরে ব্যাটারা! অমন করে কাতরাচ্ছিস কেন? নবদ্বীপবুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাঙ্ক মাথায় গুণ্ডাটাকে অদৃশ্য দেবু ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে নবদ্বীপবাবুর ঘাড়ে। নবদ্বীপবাবু সজোরে আছড়ে পড়লো পাশে রাখা

কয়লার গাদার ওপর, ট্রাঙ্কটা পড়লো তার কোমরে, লোকটা টাল সামলাতে গিয়ে ঠিকরে পড়লো দেয়ালে।

নবদ্বীপবাবু আর্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো, উঃ—হু—হু—গেছিরে বাবা, কোমরের দফা একবারে রফা করে ছেড়ে দিলে।

একজন গুণ্ডা ও পাশ থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, কি হলো, খুড়ো ?

ধুলো ঝেড়ে উঠতে উঠতে নবদ্বীপবাবু বললে, ব্যাটা টাল সামলাতে না পেরে পড়বি তো পড় একবারে আমারি ঘাড়ে। ওরে বাবা—এ যে সাঙ্ঘাতিক চোট্। উঠে দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

নবদ্বীপবাবুকে টেনে তুলে ওরা দাঁড় করিয়ে দিলে। যে লোকটি নবদ্বীপ বাবুকে সাহায্য করলে—অদৃশ্য দেবু মারলে তার গালে ঠাস করে এক চড়।

—উঃ—কে আমার গালে চড় মারলে! তুই নিশ্চয় মেরেছিস, বলে চড়-খাওয়া গুণ্ডা ধরলে পার্শ্ববর্ত্তী গুণ্ডার চুলের মুঠি।

—তবে রে শালা! ব'লে সে মারলে এক ঘুষি বন্ধুর নাকের ওপর।

নিজেদের ভেতরে লেগে গেল কুরুক্ষেত্র—মারামারি, ফাটাফাটি, রক্তারক্তি। ওদিকে অদৃশ্য দেবু গুণ্ডাদের ওপর বেপরোয়া ভাবে চালাতে লাগলো শিল, নোড়া, হাতা, খুন্তি, ঘটি, বাটি—যা হাতের কাছে জুগিয়ে উঠলো।

দেবুর অট্টহাস্যে ওদের চৈতন্য ফিরে এলো, নিজেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলে ; নবদ্বীপবাবু সভয়ে বললে, একি ভৌতিক কাণ্ড রে, বাবা!

—ভুত নয়—আমি দেবু! কেমন—মজাটা সবাই এবার টের পাচ্ছো!

—মেরে ব্যাটা লুকোচুরি খেলা খেলছো! মরদ হোস তো বেরিয়ে আয় ব্যাটা আমাদের সামনে। দু'হাতে কোমর ধরে চীৎকার ক'রে উঠলো নবদ্বীপবাবু।

—আমি তো তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি।

শূন্যে আস্ফালন করে নবদ্বীপবাবু বললে, ধাপ্পাবাজির আর জায়গা পাওনি! ধরতে পারলে একেবারে কীচক বধ করে ছেড়ে দেবো—তা জানো।

—শীগ্গীর বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে—আবি নিকালো! আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তাল তাল কয়লার চাঁই বর্ষিত হ'তে লাগলো ওদের ওপর।

—ব্যাটাকে যে একবার দেখতে পাচ্ছি না!

বলতে বলতে নবদ্বীপবাবু গিয়ে থামের আড়ালে দাঁড়াল।

—দেখতে আমায় আর কেউ পাবে না, বেরোও—নইলে একজনকেও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না!

—বেরুবো বললেই বেরুবো! আমরা কি কাপুরুষ তোর মত! তোকে কেটে—তোর রক্ত দেখে—নবদ্বীপবাবুর মুখের কথা মুখেই রইলো, সুরু হ'য়ে গেল কয়লা-বৃষ্টি। কে ছুঁড়ছে—কিছুই দেখা যাচ্ছে না—কয়লা স্তূপের ওপর থেকে শুধু কয়লার চাঁইগুলো যেন আপনা-আপনি উড়ে এসে গায়ে মাথায় সজোরে আছড়ে পড়ছে। এমন অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ঘটনা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত।

প্রতিকারের বা প্রতিরোধের কোন পন্থাই যখন খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আর মার খাওয়া যায়! ইচ্ছে করে খুন হওয়ার চেয়ে পালিয়ে বাঁচাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

মানের ধমকে পরিত্রাহী চীৎকার করতে করতে নবদ্বীপবাবু সদলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো। আর অদৃশ্য দেবুর উদ্দেশে যে সমস্ত সরস ভাষা গালাগাল হিসাবে সে ব্যবহার করলে—তা বাংলা ভাষার অভিধানে কোন দিন স্থান পায়নি আর ভবিষ্যতে কোন দিন পাবেও না!

অদৃশ্য দেবুর হাসিতে সারা বাড়ীখানা আবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো।

ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে অদৃশ্য দেবু মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলে। বায়স্কোপের ছবির মত তার চোখের সামনে ভেসে উঠল বিগত দিনের সুখ দুঃখের ছবি। সমরবাবু ভেসে উঠলেন তার চোখের ওপর। বেঁচে থেকে কোন দিন তিনি সম্মান পেলেন না, মরবার পরও সম্মানিত হবার কোন সম্ভাবনাই রইলো না। নিয়তির পরিহাসে ব্যর্থতাই তাঁর জীবনের একমাত্র পুরস্কার।

মনে পড়লো ভানুর কথা। শুকিয়ে এলো চোখের জল। হতাশার মাঝে আশার ক্ষীণ আলো ফুটে উঠলো দেবুর চোখের সামনে। দাদাবাবুর সব কিছু দায়িত্ব যে তারই উপর। এ সংসারে সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয় বলতে যদি কেউ থাকে—তবে সে হচ্ছে তার দাদাবাবু! নির্বান্ধব দুনিয়ায় আর কেউ তো তাকে চায় না।

বাড়ী যেমন খোলা পড়েছিল—তেমনি খোলাই পড়ে রইলো। দেবু বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলতে স্বরু করলে।

পথের ধারে একটা দোকান। এক ভদ্রলোক সাইকেলটা পাশে রেখে দোকানে ঢুকলেন। অদৃশ্য দেবু সাইকেলটা নিয়ে চেপে বসলো। সাইকেল ছুটে চললো রাস্তা দিয়ে!

ভদ্রলোক ছুটে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। কি আশ্চর্য্য—সাইকেলটা আপনা-আপনি ছুটে চলে যাচ্ছে। চীৎকার করতে করতে ভদ্রলোক সাইকেলের পিছনে পড়ি—কি—মরি হ'য়ে ছুটলেন, সাইকেল—আমার সাইকেল পালিয়ে যাচ্ছে। ধরুন মশাই—ধরুন।

ধরবে কি—লোকে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো চলন্ত সাইকেলের দিকে! আরোহী নেই সিটে—অথচ পথ বেয়ে সাইকেল চলেছে ছুটে। এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার এর আগে কি কারুর দেখার সৌভাগ্য হ'য়েছে! পথ-চলতি ডেঁপো ছোকরারা ছুটে চললো সাইকেলের পিছন পিছন।

ষ্টেশনের কাছাকাছি গিয়ে অদৃশ্য দেবু নামলো সাইকেল থেকে। একটা গাছে সেটা ঠেস দিয়ে রেখে ঢুকলো গিয়ে প্লাটফর্মে।

ট্রেণ এলো। বিনা টিকিটে দেবু গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। মুস্কিল বাধলো এই গাড়ীতে উঠে। সে তো সবাইকে দেখতে পাচ্ছে অথচ তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সে যত থাকতে চায় সবার কাছ থেকে দূরে সরে—ততই লোক এসে পড়ে তারই ঘাড়ের ওপর।

ট্রেণের কামরার বেঞ্চগুলি সব ভর্ত্তি হয়ে গেছে—একটা সিটও খালি নেই। অনেক ব্যাটাছেলে দাঁড়িয়ে আছে স্থানাভাবে। দেবুও একপাশে

দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেণের ঝাকানি লেগে বসে থাকা একটি বৃদ্ধা আর দিক হেলে পড়লো। বৃদ্ধা খেকিয়ে উঠলো, আ-মর, ঘাড়ে পড়িস কেনরে বাপু!

—আপনি আমাকে বলছেন? দেখুন না—আপনার কাছ থেকে আমি কতটা দূরে দাঁড়িয়ে আছি।

—তোমাকে কেন বলবো বাছা? যে আমার ঘাড়ে পড়লো—বলেছি তাকে।

বৃদ্ধার সঙ্গে আছে তার একটি তরুণী নাতনী। সে এপাশ ওপাশ চেয়ে বললে, কেউ তো পড়েনি দিদিমা!

—আমার কি তবে ভীমরতি হ'য়েছে ল্যা! ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো নাতনীকে।

ওপরের একটা বাঙ্ক খালি ছিল। অদৃশ্য দেব ঐ বাঙ্কের ওপর উঠে বসাই সিদ্ধান্ত করলে। যাত্রীদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকাই যুক্তিসঙ্গত। সে ওপরের বাঙ্কে উঠতে গিয়ে হাত ফসকে পড়ে পড়লো—নীচের বেঞ্চে বসে থাকা একটি তরুণী বধূর কোলের ওপর। মুহূর্ত্ত মধ্যে দেব নিজেকে সামলে নিয়ে ওপরে উঠে গেল। বধূটি অস্ফুট কণ্ঠে চমকে উঠলো।

তরুণী বললে, কি হলো, বৌদি? অমন আঁতকে উঠলেন কেন?

—কে যেন আমার কোলের ওপর বসে পড়েছিল। তরুণীর কানে কানে বধূটি বললে।

—ধ্যেৎ, পাগল নাকি! বলে তরুণী হেসে ফেললে।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবক তার পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোককে বললে, ঠিক হ'য়ে দাঁড়ান না মশাই। গায়ের ওপর এসে পড়ছেন কেন?

বাঙ্কের ওপর দিকে চাইতে চাইতে ভদ্রলোক বললেন, দোষ আমার নয় মশাই—কে যেন আমার ঘাড়ে পা দিয়ে বাঙ্কের ওধারে সরে গেল।

—আপনার কি মাথা খারাপ? দেখছেন না—বাঙ্ক তো খালি।

—তাই তো দেখছি!

যুবকটি বললে, নীচে দাঁড়িয়ে না থেকে—চলুন বাঙ্কে উঠে বসা যাক্।

—নীচের বেঞ্চ খালি হবার সম্ভাবনা আছে কি নেই কে জানে। চলুন—ওপরে উঠেই বসা যাক্। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ওপরে ওঠবার জন্য প্রস্তুত হলো।

বিপদ আর কাকে বলে! দেবুকে আবার নামতেই হলো। এবার সে নেমে এলো অতি সন্তর্পণে। কিন্তু নীচে নেমে যেখানে দাঁড়াতে যায়—সেখানেই ফাঁকা মনে ক'রে অন্য যাত্রী এসে আশ্রয় নিতে চায়। নিরুপায় হ'য়ে শেষ পর্যান্ত দেবুকে গিয়ে পাইখানার মধ্যে ঢুকতে হলো।

—দরজাটা আপনা-আপনি খুলে গেল ব'লে মনে হচ্ছে!

—ও কিছু না—হাওয়ায়। উঃ, বিশ্রী গন্ধ আসছে। দিন না মশাই—দরজাটা বন্ধ করে।

দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোক পাইখানার দরজাটা টেনে বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। ট্রেণের পাইখানার মধ্যে অদৃশ্য দেবু রইলো ইচ্ছা করে বন্দী হ'য়ে। অদৃষ্টে দুর্ভোগ থাকলে—স্বয়ং বিধাতাও তা রদ করতে পারেন না।

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়—ট্রেণের আলো তখনও জ্বলেনি। জনৈক ভদ্রলোক শারীরিক ক্রিয়ার তাগিদে পাইখানার মধ্যে অতর্কিতে এসে ঢুকে পড়লেন। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য দেবুর সঙ্গে হ'য়ে গেল মাথা ঠোকাঠুকি। হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। কি ঘটে গেল—বুঝতে না পারে—তিনি স্তব্ধ হ'য়ে তাড়াতাড়ি পাইখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। শারীরিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা তাঁর আর ঘটে উঠলো না। এত দুঃখেও দেবুর হাসতে ইচ্ছা হলো কিন্তু সে ইচ্ছাকে দেবু দমন করলে। কে জানে—তার হাসিকে ভৌতিক হাসি ভেবে নিয়ে সারা কামরার মেয়ে-পুরুষ এখুনি হয়তো একটা হুল-স্থূল কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। কাজ কি ওসব শুকনো ঝামেলা বাড়িয়ে। ঢের রসিকতা হ'য়েছে—এখন ট্রেণ থেকে একবার নামতে পারলে হাঁফছেড়ে বাঁচা যায়। ঝকমারি আর কাকে বলে! নবদ্বীপকে জব্দ করতে গিয়ে কি জব্দ যে নিজেকে হতে হচ্ছে, তা বলে বোঝাবার নয়।

হাওড়া ষ্টেশন। ট্রেণ এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে গেল। অদৃশ্য দেবু সবার আগে নেমে পড়লো। যথাসম্ভব পাশ কাটিয়ে, ধাক্কা-ধাক্কি বাঁচিয়ে ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে অদৃশ্য দেবু টিকেট-কালেক্টরের সামনা-সামনি এসে গেল।

একটি লোক যাবার মত জায়গা রেখে গেট আটকে দাঁড়িয়ে আছে টিকেট-কালেক্টর। একখানি করে টিকিট দেখে নিচ্ছে আর একটি করে লোককে যাবার পথ করে দিচ্ছে। উপায় না দেখে অদৃশ্য দেবু টিকেট-কালেক্টর সাহেবকে সজোরে একটি ধাক্কা দিয়ে প্লাটফর্মের বাইরে চলে গেল। টাল সামলাতে না পেরে ভদ্রলোক চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলেন। হাতের সংগ্রহীত টিকেটগুলো ছড়িয়ে গেল চারধারে।

তাড়াতাড়ি একটা পুলিশ ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা দু'জন প্যাসেঞ্জারকে দোষী ভেবে দু'হাতে দু'জনের জামার কলার চেপে ধরলে।

টিকেট-কলেক্টর ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, নিয়ে যাও উল্লুকদের!

—আরে মশাই! আমাদের তো হাতে এখনো টিকেট রয়েছে। আমরা কেন ধাক্কা মারবো!

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, বিনাটিকেটের যাত্রা কেউ মেরে থাকবে! শুধু শুধু আমাদের হাররান!

কে কার কথা শোনে। ফাঁকামাঠে লাঠি-ঘোরানোর মত কথাগুলো তাদের বাতাসে ভেসে গেল। কাকুতি, মিনতি, আক্ষেপ—সব কিছুই মাঠে মারা গেল। লাল পাগড়ী-পরা খোট্টা পুলিশ তাদের টান্‌তে টান্‌তে যথাস্থানে নিয়ে চলেছে।

অদৃশ্য দেবু অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা নিজের মনে হেসে নিলে। কিন্তু দু'টি গ্রাম্য, নিরীহ লোকের অবস্থা দেখে তার মুখের হাসি নিভে গেল। ছাতুখোর পুলিশটা দু' হাতে তাদের ঘাড় চেপে ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে। দোষ করলে যে—সে ওদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, বিনা

দোষে শাস্তি পাবে দু'টি গোবেচারী নিরীহ লোক। না—এ হতেই পারে না।

অদৃশ্য দেবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে পুলিশটাকে বেশ কায়দা করে মারলে ল্যাঙ। পুলিশটা চিৎপাত হ'য়ে পড়ে গেল। দেবু তখন ঐ দুটো লোকের হাতে ধরে টান্তে টান্তে ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো।

যথাসম্ভব নিরাপদ স্থানে ওদের এনে বললে, দু'জনে দু'দিকে শীগ্গীর পালান। এবার ধরলে আর ছাড়ান পাবেন না।

কে তাদের ভিড়ের ভেতর থেকে টেনে আনলে—কে-ইবা তাদের ছুটে পালাতে বলছে—কিছুই তারা বুঝলে না। বোঝবার মত মানসিক অবস্থা তখন তাদের নয়। তারা যে যেদিকে পারলে—টেনে ছুট মারলে।

মুহূর্ত্তমধ্যে জনকয়েক পুলিশ ছুটে এলো তাদের ধরবার জন্যে—কিন্তু তথাকথিত আসামীরা তখন তাদের নাগালের বাইরে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে! পুলিশ আর জনতা বিহ্বল নয়নে এধার ওধার চেয়ে দেখতে লাগলো। ব্যাপারটা যেন ভোজবাজীর মতই অলৌকিক বলে সবার মনে হলো।

অদৃশ্য দেবু ব্যাকুল জনতার দিকে চেয়ে একটু হাসলে; তারপর নিজেকে গাড়ী-ঘোড়া, মোটার, বাস, ট্রামের কবল থেকে বাঁচিয়ে পথ চলতে সুরু করলে।

হাওড়ার পুল পেরিয়ে এপারে এসে একটা গ্যাসপোষ্টের তলায় দাঁড়াল দেবু। চলতে আর ইচ্ছা যাচ্ছে না। ট্রাম, বাসে গাদা-গাদা লোক, ওদের মধ্যে উঠে শুধু হাঙ্গামার সৃষ্টি করে লাভ কি! তার চেয়ে একটা রিক্সা চড়লে কেমন হয়! কিন্তু রিকিসা ডেকে কথা বলতে গেলেই তো ব্যাটা ভড়কে যাবে! আচ্ছা, দেখাই যাক না একটু মজা করে।

অদৃশ্য দেবু ডাকলে, এ্যাই রিক্সা।

—আইয়ে বাবু! ব'লে অদূরে দাঁড়িয়ে-থাকা এক ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে রিক্সাওয়ালা হাজির।

ভদ্রলোক বোধ হয় ট্রাম কিম্বা বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গম্ভীর খে তিনি বললেন, হাম নেহি বোলায়া!

—আরে বাপ্! ঝুট-মুট্ কোন্ বোলায়া! ব'লে রিক্সাওয়ালা কাছাকাছি ায়মান লোকগুলোর মুখের দিকে তাকালে।

আবার গ্যাসপোষ্টের তলা থেকে শব্দ এলো, ভাড়া যায়গা?

রিক্সাওয়ালা এগিয়ে আসতে আসতে বললে, জরুর যায়েগা। লেকেন— লাতা কোন্? আপ্ বোলায়া?

—দিল্লাগি করতা হ্যায়! বলতে বলতে লোকটি ছুটে গিয়ে চলন্ত বাসের াণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়লো।

--দিল্লাগি করকে বোলাতা হ্যায়—ফিন্ গোঁসা করতা হ্যায়! ব'লে ক্সাওয়ালা ফুটপাথের ধারে রিক্সা রেখে খৈনি তৈরী করে গালের পাশে দিয়ে ক্সা নিয়ে আবার এগিয়ে চললো।

পিছনে সিটের দিকে একবার চেয়ে রিক্সাওয়ালা চলতে চলতে বললে, ারে বাপ্—এতনা ভারি লাগতা কাহে। সোয়ারী নেহি—কই নেহি— ব্বি।

রিক্সাওয়ালা খৈনি খাবার অবসরে অদৃশ্য দেবু রিক্সায় উঠে বসেছিল। চারা রিক্সাওয়ালা! সন্ধ্যার বাতি জ্বলে উঠলো সহরের বুকে, রিক্সাওয়ালা ায়ারীর সন্ধানে ধীরে পথ বেয়ে চলেছে। এত আস্তে চলা দেবুর ভাল াগছিল না, খেয়ালের বশে সে ব'লে বসলো, জোরসে চালাও!

—কেয়া? কে বলছে—কোথা থেকে বলছে—কিছুই সে বুঝতে বলে না।

—বখশিস মিলেগা। থোড়া জোরসে—

—আপ্ কোন হ্যায়?

—আদমি হ্যায়!

—কাঁহাসে বাত করতা হেঁ?

—রিক্সা পর!

—আরে বাপ্—ভুত লাগা পিছে! বলতে বলতে রিক্সাওয়ালা রিক্সাটা আছড়ে ফেললে।—আরে ভেইয়া! মেরা রিক্সা পর ভুত উঠা! বলতে বলতে সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে গেল!

অদৃশ্য দেবু রিক্সা থেকে নেমে তার গন্তব্য স্থানের দিকে পায়ে হেঁটেই এগিয়ে চললো।

পথ চলতে চলতে দেখলে খাবারের দোকানে থরে থরে খাবার সাজানো রয়েছে। খাবার দেখে এতক্ষণে দেবুর মনে হলো যে সে আজ অভুক্ত! সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিদে যেন তার চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

একটা সন্দেশের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলে একটা ছোট ছেলে বেচা-কেনা কচ্ছে আর প্রৌঢ়গোছের একটা লোক ভিতর দিকে বসে কি যেন তৈরী কচ্ছে। দেবু দাঁড়িয়ে গেল, একে একে খদ্দেররা চলে গেল, দেবু দোকানের ঠিক পাশে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়েই টপাটপ্ সন্দেশ মুখে ফেলতে লাগলো।

হঠাৎ দোকানদার ছেলেটার লক্ষ্য পড়লো সন্দেশগুলো একটার পর একটা হাতখানেক উঠেই কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

আতঙ্কভরা কণ্ঠে ছেলেটা বলে উঠলো, বাবু! একটার পর একটা সন্দেশ উপে যাচ্ছে!

—এঁ্যা!—উপে যাচ্ছে কিরে! বলতে বলতে প্রৌঢ় লোকটি এসে দেখলে সন্দেশের থালা প্রায় অর্দ্ধেক খালি।

ছেলেটার চীৎকার শুনেই দেবু হাত তুলে নিয়ে পাশে সরে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উপে যাওয়াও বন্ধ হ'য়ে গেছে।

—কৈ—কোথা উপে যাচ্ছে? চালাকি পেয়েছিস?

ছেলেটা আমতা আমতা করে বললে, এইতো উপে যাচ্ছিল।

প্রৌঢ় লোকটা সজোরে মারলে ছেলেটার গালে এক থাপ্পোড়।—দেখা বেটা—কোথা যাচ্ছে! নিজে খেয়ে—বলা হচ্ছে কিনা উপে যাচ্ছে!

ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্য অদৃশ্য দেবু আবার টপাটপ্ সন্দেশ খেতে সুরু

করে দিলে। অবশ্য এবার তার না খেলেও চলতো কারণ প্রয়োজন তার আগেই মিটে গেসলো।

কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটা বললে, ঐ তো—আবার উপে যাচ্ছে!

সত্যিই তো! চোখ দুটো হাত দিয়ে রগড়ে নিয়ে বড় বড় চোখ করে প্রৌঢ় সন্দেশের থালার দিকে চেয়ে রইলো, তারপর খপ্ করে থালাটা তুলে নিলে। এবার উপে যেতে লাগলো—রসগোল্লা!

—কে কোথা আছেন—দেখে যান! আমার সব্বোনাশ হ'য়ে গেল। খাবার সব উপে যাচ্ছে! প্রৌঢ় দোকানীর চীৎকারে মুহূর্ত্ত মধ্যে দোকানের সামনে ভিড় জমে গেল।

ভিড় জমবার আগেই দেবু সেখনে থেকে সরে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে খাবার উপে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। জনতা এসে কিছুই দেখতে পেলে না।

কৈ—কোথা হে খাবার উপে যাচ্ছে?

কাঁদো কাঁদো গলায় প্রৌঢ় দোকানী বললে, বিশ্বাস করুন—টপাটপ্ উপে যাচ্ছিল। এই দেখুন না—সন্দেশের থালা একেবারে খালি।

আমরা আসতেই উপে যাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেল! খুব রসিকতা শিখেছো যে!

বিশ্বাস করুন, বাবু মশাইরা! আর আমাকে বিশ্বাস না করেন—এই বাচ্ছাকে জিজ্ঞেস করুন! শুধু শুধু আপনাদের ডেকে আমি কি মস্করা। অথচ আপনারা আসার সঙ্গে সঙ্গে—তাজ্জব ব্যাপার মশাই—তাজ্জব ব্যাপার!

ভিড়ের ভিতর থেকে গলায় রুমাল বাধা, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা একটি ছেলে বললে, আমরা কিন্তু এখুনি তোমার দোকান-কে—দোকানই উপিয়ে দিতে পারি! আর একবার দেখবে নাকি নিজের চোখে!

প্রৌঢ় গলায় গামছা দিয়ে জোড় হাত করে বললে, বাবা বিশ্বনাথের দিব্যি—কালিঘাটের মা কালীর দিব্যি—আমি মিছে কথা বলিনি। তবুও যদি কিছু কসুর করে থাকি—মাপ চাইছি আপনাদের কাছে।

—বাঁচি যাও ভাই—বাঁচি যাও!

—কি হলো এখানে মশাই ?

—আর বলেন কেন—যত সব কেলেগোলার কাণ্ড ! বলে কিনা—ওর দোকানের রসগোল্লা, সন্দেশ সব আপনা-আপনি উপে যাচ্ছে !

—ক'দ্দিন মাথা খারাপ হ'য়েছে ?

যার যা মনে এলো সে তাই মন্তব্য করে চলে গেল। দেবু পাশের দোকান থেকে একখিলি পান মুখে দিয়ে আবার পথ চলতে সুরু করলে।

রাত প্রায় এগারটা। খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে ভানু নিজের ঘরে বসে পড়ছে। অরুণের দল এসে হানা দিলে।

পশুপতি ঘুমের প্রতীক্ষায় শুয়েছিল, ওদের দেখে উঠে বসলো। বললে কি বাবা—এত রা—রা—রাত্রে এলে আ—আ—আড্ডা জমাতে। সু—সু—সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সাহেব জানিতে পারলে আস্ত ক—ক—কবর দিয়ে দেবে।

অরুণ বললে তার সার্টের আস্তিন গোটাতে গোটাতে, আমরা আড্ডা দিতে আসিনি ! আমরা এসেছি—

—একটা বোঝাপড়া করতে। বললে জহর।

—বো—বো—বোঝাপড়া ! কিসের বোঝাপড়া—কা—কা—কার সঙ্গে ?

—ভানুবাবুর সঙ্গে। বললে অজিত।

—আমার.সঙ্গে ! বিস্মিত কণ্ঠে বললে ভানু।

—নিশ্চয় ! আপনি করবেন অপমান আর বোঝাপড়া হবে কি পশুপতির সঙ্গে ?

—অপমান ! আমি করেছি ? আপনাদের ?

টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে জহর বললে, আলবৎ করেছেন।

—দেখুন—মান থাকলে তবে অপমান হবার দাবী ওঠে। বলে ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি হাসলে ভানু।

—আপনি কি বলতে চান—আমাদের মান নেই ?

—সেটা আমার চেয়ে নিজেরাই ভাল বোঝেন ! ভানুর কণ্ঠে ঔদাসীন্য পরিস্ফুট ।

অরুণ এগিয়ে এসে দাঁড়াল ভানুর সামনা-সামনি । বললে নিজের হাতের চেটোর ওপর ঘুষি মেরে, সাবধান ভানুবাবু ! কথার প্যাঁচে আপনি আবার আমাদের অপমান কচ্ছেন ।

—বলি—হা—হা—হাত থাকতে সব মুখোমুখি কেন ?

—এবার সেই হাতাহাতির ব্যবস্থাই হবে ।

পশুপতি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল । বললে, ডু—ডু—ডুয়েল তো ? আমি তোমাদের রে—রে—রে—রেফারির কাজ করবো ।

অনুপ শূন্যে একটা ঘুষি ছুঁড়ে বললে, ফাইটা-ফাইটি হ'য়ে যাবে—হুঁ—বুঝছো মণি !

সমীর পান চিবুতে চিবুতে এসে ঘরে ঢুকলো । রসাত্মক কণ্ঠে বললে, বলি—হলোটা কি ? এত গরম কেন সব ?

জহর এগিয়ে এলো সমীরের সামনে । বললে, জানেন সমীরদা ! সেদিন সাবিত্রীদের বাড়ী বসে ভানুবাবু আমাদের indirectly অপমান করেছেন ।

—No—Never ! আমি আপনাকে বা আপনাদের কোন অপমান করিনি ।

—ঠিক আপনি করেননি—করেছেন আপনার Lady-loveএর মাসীমা !

—সে দোষ কি আমার ?

—কথামালায় পড়া ব্যাঘ্র আর মেষশাবকের কথা মনে পড়ে গেল হে পশুপতি ! ব'লে সমীর তার সিটে গিয়ে বসলো ।

—কি চান আপনারা ?

—আমরা চাই প্রতিশোধ ।

পশুপতি বললে, প্র—প্র—প্রতিশোধটা কি ক'রে নেওয়া হবে ?

বক্সিঙের পোজ দেখিয়ে পাপু বললে, এই—এইরকম—অর্থাৎ বক্সিঙ্ ।

অরুণ বললে, ভানুবাবুকে আমাদের জহরের সঙ্গে বক্‌সিঙ্‌ লড়তে হবে।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে সমীর বললে, পাশাখেলায় দুর্যোধন নিমন্ত্রণ করেছিল পাণ্ডবদের, আর তোমরা আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছো বক্‌সিঙ্‌এ। অতি উত্তম প্রস্তাব!

—আপনি কি ওদের দলে? জিজ্ঞাসা করলে অরুণ।

—নিশ্চয়! ভানুবাবু যে আমার আশ্রিত—I mean—আমার রুম-মেট!

জহর বললে, ঠিক আছে!

পশুপতি বীরদর্পে বললে, ভা—ভা—ভানুর হ'য়ে আমরা এই চ্যা—চ্যা—চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কচ্ছি!

সোল্লাসে অরুণের দল চলে গেল নিজেদের ঘরে। সমীর 'মা-ভৈঃ' বলে বিছানা নিলে। পশুপতি আশ্বাস দিয়ে গলা পর্য্যন্ত চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লো। শোওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তাদের নাসিকাধ্বনি শোনা গেল। ভানু যেমন বসেছিল তেমনি বসেই রইলো। একি শুষ্ক উপসর্গ! মারামারি নিজে সে কোনদিন করেনি, অপরকে মারামারি করতে দেখেছে মাত্র। ডেকে-হেঁকে লোকজনের সামনে না মেরে—ওরা এমনিই তো ঘা-কয়েক মেরে গেলে পারতো! আচ্ছা মুস্কিল হলো তো এই কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে! কল্পনার চোখে ভানু দেখতে পেলে—কলেজের হাজার ছাত্র-ছাত্রী এসেছে বক্‌সিঙ্‌ দেখতে। জহর ঘুষির পর ঘুষি চালিয়ে যাচ্ছে ভানুর ওপর অবিশ্রান্ত ভাবে। ভানু প্রতিরোধ করতেও পাচ্ছে না। তার নাক মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরুচ্ছে। দর্শকরা হাজার কণ্ঠে জহরকে বাহবা দিচ্ছে।

—উঃ অসহ্য! অস্ফুট কণ্ঠে বলে ভানু ঘরময় বার কয়েক পায়চারি করে বেড়াল।

পরিশ্রান্ত হ'য়ে ভানু চেয়ারে এসে বসলো—গালে হাত দিয়ে আবার ভাবতে সুরু করলে। ঢঙ্‌-ঢঙ্‌ করে ঘড়িতে বারোটা বাজলো। ভানু উঠে গিয়ে পশুপতির পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই বার করে নিয়ে এলো। জীবনে সে আজ এই প্রথম সিগারেট খাবে!

চেয়ারে বসে সিগারেট মুখে দিয়ে দেশলাই জ্বাললে ভানু। কে যেন ফুঁ দিয়ে কাঠিটা নিভিয়ে দিলে। কৈ—হাওয়া তো নেই! আবার একটা কাঠি জ্বাললে। জ্বলন্ত কাঠি মুখের কাছে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফুঁ। কাঠিটা এবারেও গেল নিভে। বার বার তিনবার—ধরাতে পারে ভালো, নচেৎ—আবার কাঠি ধরিয়ে সিগারেটের মুখে অগ্নি সংযোগ করবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কাঠি নিভে গেল।

—ধ্যেৎ তেরি—তোর সিগারেটের নিকুচি করেছে! বলে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলতে গেল ভানু। এমন সময় পাশ থেকে কে যেন বললে, পয়সার জিনিষ অমন করে নষ্ট করতে নেই। এবার ধরাও—আর নিভবে না।

—কে! কে কথা বললে! কৈ—কেউ তো নেই। সমীরদা! পশুপতি—!

—চুপ—চেঁচিও না!

—কে—কে কথা বলছো? ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ভানু চেঁচিয়ে উঠলো।

—আঃ—আমি—আমি দেবু!

—দেবুদা! তুমি!

—হ্যাঁ—গলার স্বর শুনে বুঝতে পাচ্ছো না?

—কৈ—কোথা তুমি? চারিদিক চেয়ে দেখতে দেখতে কম্পিত কণ্ঠে বললে ভানু।

—এই যে—তোমার টেবিলের ধারে—অত ভয় পাচ্ছো কেন!

—ভয়! না—ভয় ঠিক পাচ্ছি না। কিন্তু আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। কেন?

—কিন্তু আমি তো তোমায় বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

শুষ্ক কণ্ঠে ভানু বললে, তবে কি—তবে কি তুমি মরে ভূত হ'য়ে এসেছো? স-স-সমীরদা—

—আঃ চুপ্ চুপ্! এত ভীতু তুমি। বাবুর সেই আবিষ্কার করা ওষুধ খেয়ে আমি অদৃশ্য হ'য়ে গেছি। ভূত হইনি—বিশ্বাস কর।

—কিন্তু—কিন্তু কেমন করে আমি বিশ্বাস করবো!

—এই ছ্যাখো—তোমার গায়ে আমি চিমটি কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি। অদৃশ্য দেবু সজোরে চিমটি কাটলে ভানুর হাতে।

—উঃ—চিমটিটা বড্ড জোর কেটেছো! যাক্‌গে—তাহ'লে তুমি সত্যি সত্যি বেঁচে আছো! তা যেন হলো—কিন্তু কবে আবার আমি তোমায় দেখতে পাবো?

—তাতো জানি না।

—আচ্ছা মুস্কিলের কাণ্ড তো! তা না জেনে খেলে কেন? বিরক্তিভর কণ্ঠে বললে ভানু।

—সে অনেক কথা—পরে শুনো। আপাততঃ ভয়ে তোমার গলা শুকিয়ে গেছে। এক গ্লাস জল খাও। কুঁজো কৈ—ঐ তো। বলে অদৃশ্য দেবু কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এনে ভানুর সামনে গ্লাসটা ধরলে।

সমীর আর পশুপতির কাঁচা ঘুম হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। ভানু যেন কার সঙ্গে কথা বলছে, অথচ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে চোখে দেখা যাচ্ছে না। ঘুম চোখে ব্যাপারটা ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। হঠাৎ তাদের চোখে পড়লো—একটা জল ভর্ত্তি গ্লাস ভানুর সামনে আপনা-আপনি এসে হাজির হ'য়ে গেল। অথচ যে গ্লাসটা নিয়ে এলো—তাকে দেখা যাচ্ছে না। শূন্য থেকে ভানু গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঢক-ঢক করে খেয়ে ফেললে। ভয়ে ওদের মুখে কথা ফুটলো না। আর কি ঘটে—তা চোখ চেয়ে দেখবার সাহসটুকুও ওরা হারিয়ে ফেললে। ভয়ে সর্ব শরীর ওদের থর-থর ক'রে কেঁপে উঠলো। কাঁপতে কাঁপতে মাথা পর্য্যন্ত কোন রকমে চাদরটা চাপা দিয়ে মড়ার মত কাঠ হ'য়ে রইল।

ভর্ত্তি এক গ্লাস জল খেয়ে ভানু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে, আঃ! কিন্তু বক্‌সিঙের ব্যাপারটা কি হবে—যা পারে হবে—ও নিয়ে আর ভাবতে পারা যায় না। ভাবলেই মাথা গরম হ'য়ে উঠবে—তার চেয়ে শুয়ে পড়া যাক

Boxing groundএ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মহা আনন্দে গ্যালারির ওপর

বসে গেছে। স্থানাভাবে বহু ছাত্র-ছাত্রী মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে জটলা কচ্ছে। প্রফেসর দু' পাঁচজনও যে না এসেছেন—এমন নয়। সর্ব্বত্রই একটা চাঞ্চল্যের সাড়া।

বক্সিং গ্লাভ্‌স হাতে, পরণে হাফ-প্যাণ্ট, গায়ে গেঞ্জী, কাঁধে টাওয়েল নিয়ে ভানু আগেই এসে দাঁড়িয়েছে—বক্সিং প্ল্যাটফর্মে ওঠবার মুখে। উৎসাহিত করতে সঙ্গে তার আছে সমীর আর পশুপতি।

বক্সিঙের সাজে সজ্জিত হ'য়ে জহরকে বীরবিক্রমে রণস্থলে আসতে দেখা গেল। বন্ধুকে আদা, ছোলা দিয়ে cheer-up করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে এল দলপতি অরুণ, অজিত, পাপু আর অনুপ।

যাত্রার আসরে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের দৃশ্যে গদাযুদ্ধের আগে ভীম আর দুর্য্যোধনের মধ্যে আসর গরম করার উপযোগী বেশ খানিকটা বাকযুদ্ধ হ'য়ে থাকে—প্ল্যাটফর্মে ওঠবার আগে কথা-কাটাকাটির মধ্য দিয়ে বেশ খানিকটা বাকযুদ্ধ এদের মধ্যেও হ'য়ে গেল।

বন্ধুরা জহরকে আদা-ছোলা খাইয়ে দিলে। হাতে বক্সিং গ্লভস্—কি করেই বা নিজের হাতে খাবে? চাঙ্গা হ'য়ে জহর সিঁড়ি টপকে লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে পড়লো।

—আমাদের আ—আ—আদা-ছোলা নেই রে! পশুপতি ওদের ঠোঙাভর্ত্তি আদাছোলার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে বোধ হয় বাতাসের উদ্দেশেই বললে।

—দরকার নেই। বলে ভানু প্রায় কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠলো। অবশ্য ওঠবার সময় টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল—সমীরই ধরে ফেললে।

উল্লসিত ছাত্রদের মিলিত চীৎকারে শুধু মাঠ কেন—বুঝি প্ল্যাটফর্মটাও কেঁপে উঠলো। একা সাবিত্রী শুধু সে উল্লাসে যোগ দিতে পারলে না। পাথরের মত সে নিশ্চল হ'য়ে বসে রইলো।

রেফারীর পদে বরণ করা হয়েছে হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ধীরাজবাবুকে! তাঁর নির্দ্দেশে বক্সিং সুরু হয়ে গেল। একদল ছাত্র-ছাত্রী নিয়েছে জহরের পক্ষ আর একদল নিয়েছে ভানুর পক্ষ।

জহর একটা গুণ্ডা বিশেষ। তার ওপর বক্‌সিঙ্‌ করা তার অভ্যাস আছে। কিন্তু ভানুর আজ হাতে-খড়ি। বক্‌সিঙের কায়দা-কানুন কিছুই তার জানা নেই। শুধু মানের খাতিরে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। জহরের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন! বেচারা এলো-পাথাড়ি মার খাচ্ছে। জহরের দল যত তার বাহবা দেয়—সাবিত্রীর মুখ ততই চূণ হ'য়ে আসে। ভানুকে গো-হারাণ হারিয়ে দিচ্ছে 'ওর—ওর তো প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা—চোখের কোণে জল এই এলো বলে।

হঠাৎ বিড়ালের ভাগ্যে শিকেটা একবার ছিঁড়ে গেল। জহরের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ভানু মারলে টেনে তার মুখের উপর পটা-পট্‌ দুই ঘুষি।

ভানুর সমর্থক দলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এবার সাবিত্রীও বললে, সাবাস্‌, ভানুদা!

সাবিত্রীর এখন এক চোখে কান্না—অন্য চোখে হাসি।

জহর! জ্যান্ত গোখরা সাপের লেজে পা তুলে দিলে—তার অবস্থা যেমন হয়, জহরের অবস্থা ঠিক তাই বা তার চেয়েও বেশ খানিকটা বেশী ভয়াবহ। জহর এবার মরিয়া হ'য়ে যা ঘুষি চালিয়ে গেল ভানুর ওপর—তা একমাত্র ভানুই বুঝলে—ঠিক মর্ম্মে মর্ম্মে নয়—যাকে বলে হাড়ে হাড়ে।

জহরের ঘুষি গিয়ে পড়ে ভানুর ঘাড়ে, মুখে, রগের কোল ঘেঁসে—আর সাবিত্রী আঁতকে আঁতকে উঠে এপাশ ওপাশ সরে সরে বসে, যেন ঘুষিগুলো তারই ওপর বর্ষিত হচ্ছে।

জহরকে যারা উৎসাহিত করে—তাদের দিকে রাগে, দুঃখে কট্‌-মটিয়ে চায় সাবিত্রী আর ভানুকে যারা উৎসাহিত করে—তাদের কি ভালই না লাগে তার!

মারের চোটে ভানু প্রায় কুঁকড়ে এসেছে, আর ঘা-কয়েক তার ওপর পড়লেই মূর্চ্ছা অবশ্যম্ভাবী। এ হেন সাঙ্ঘাতিক মুহূর্ত্তে দেখা গেল—অদৃশ্য ঘুষির চোটে জহর প্রায় কাবু হ'য়ে এসেছে। মুখ, মাথা ফুলে সে এক বিতিকিশ্রী কাণ্ড! কে যে ঘুষি চালাচ্ছে—তাকেও দেখা যাচ্ছে না আর ঘুষিটাও চর্ম্ম-চক্ষে ধরা পড়ছে না, অথচ ঘুষি চলছে আর সে ঘুষি যে কি সাঙ্ঘাতিক ঘুষি তা বুঝতে পাচ্ছে জহর।

রেফারিও অবাক! কোথা থেকে ঘুসি আসছে তা ধরতে পারলে তবে তো তাকে নিবারণ করবে! জহরকে বাঁচাতে চেষ্টার ত্রুটি তিনি করলেন না, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! জহর শেষ পর্য্যন্ত আর সহ্য করতে না পেরে প্ল্যাটফর্মের ওপর লুটিয়ে পড়লো। অন্তরীক্ষ থেকে যে তার ওপর অবিশ্রান্ত ভাবে ঘুষি চালিয়ে গেল—সে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ যে হোক সে হোক—অন্ততঃ ভানু নয়!

পরের দিন সকালে।

ভানুর ঘুম ভাঙতেই মনে পড়লো গতকালের বক্‌সিঙের কথা। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলে—সারা অঙ্গ তার ব্যথায় আড়ষ্ট! হোষ্টেলের বেয়ারা বঁধুয়া চা দিয়ে গেল। ভানু মাথা তুলে আড় হ'য়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। ঘুম চোখে না আসলেও চোখ বুজে পড়ে রইলো।

সমীর পশু উঠে মুখ হাত ধুতে চলে গেল। ঘর ফাঁকা।

—আর কতক্ষণ শুয়ে থাকবে? কলেজ যেতে হবে না? অদৃশ্য দেবু ভানুর শিয়রে দাঁড়িয়ে বললে!

চোখ মেলে ভানু দেখলে ঘরে কেউ নেই। বললে, উঠতে আজ আর ইচ্ছে যাচ্ছে না দেবুদা। সারা গায়ে ব্যথা।

—আরো হতো যদি না ওরা ঘুমোবার পর কাল রাত্রে তোমার গায়ে তেল মালিস করে দিতুম। শুয়ে থাকলে ব্যথা আরো জড়িয়ে ধরবে। স্নান খাওয়া সেরে কলেজ যাও। চলাফেরা করলে গায়ের ব্যথা আপনি সেরে যাবে।

—তা যেন যাবে—কিন্তু কালকের ব্যাপারটা কি হলো বলতো! আমি তো কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছি না যে—ব্যাটা জহর হঠাৎ কি করে অমন ঘায়েল হ'য়ে পড়লো!

—সাত সকালে ওসব বোঝাবুঝির কি কিছু দরকার হচ্ছে? নাও—নাও—উঠে পড়।

—দস্তুরমত ভৌতিক ব্যাপার! বলতে বলতে ভানু উঠে বসলো।

—ভৌতিক না হ'য়ে মানবিক তো হতে পারে।

—মানবিক ! এ তা'হলে তোমার কারসাজি। ব'লে ভানুর যে দিক থেকে দেবুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল—সে দিকে ফিরে চাইলে।

—এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে ! তুমি বেকায়দায় পড়েছো দেখে—দিলুম ব্যাটাকে ঘুষিয়ে ফ্ল্যাট করে ! হাসতে হাসতে বললে দেবু।

—না—না—না—অত—মার মারা—মানে একবারে মেরে ফাটিয়ে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।

—চুপ—ওরা আসছে। তুমি খেয়ে দেয়ে কলেজ যাও, আমি বেরুচ্ছি সহর ঘুরতে।

—Good morning চ্যাম্পিয়ন ! সমীর ঘরে ঢুকে ভানুর উদ্দেশে বললে।

—কেউ বি—বি—বিশ্বাসই করতে চায় না যে তো—তো—তোমার ঘুষির এত জোর। বলে পশুপতি ক্যাবলার মত হাসতে লাগলো।

কোমরে দু'হাত দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ভানু টেনে টেনে ব্যথা-কাতর স্বরে বললে, আমার ঘুষির যে এত জোর—সে কথা কি ছাই আমিই জানতাম ! যাক্‌গে—স্নানটা সকাল-সকাল সেরে আসা যাক্। বাপ্‌রে, সারা গা একবারে টাটিয়ে বিষ ফোঁড়া।

দু'পাটি দাঁত বার করে পশুপতি বললে, না—না—নাইতে খেতে গায়ের ব্য—ব্য—ব্যথা আপনি সেরে যাবে।

—ভা—ভা—ভাগ্যিস বললি ! রসিকতা ক'রে ভানু সাবান ও টাওয়েল নিয়ে স্নানের ঘরে চলে গেল।

ওদিকে জহর তখনও বিছানায় শুয়ে! তার মাথায় আর ডান কাঁধে ব্যাণ্ডেজ। চোখ মুখ বেশ ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে।

অরুণ, অজিত, অনুপ, পাপু প্রভৃতি তাকে ঘিরে বসে জটলা কচ্ছে আর পরাজয়ের আফশোষে এক একজন দু'তিন পেয়ালা করে চা খেয়ে মনের ক্ষত ঘায়ে প্রলেপ দিচ্ছে।

একটা সিগারেট নিজে ধরিয়ে আর জহরের মুখের সিগারেটটায় অগ্নি সংযোগ করে দলপতি অরুণ বললে, ব্যাটার ঐ তো পিঙ্‌খাড় চেহারা ! ফুঁ দিলে উড়ে যায়। এত শক্তি ব্যাটা পেলে কোথা ?

অজিত জলন্ত সিগারেটটা অরুণের হাত থেকে নিয়ে গোটা দুই টান মেরে বললে, হুঁ—চিন্তার কথা!

—উ· ঘুষি তো নয়—যেন বজ্রমুষ্ঠি! কি বলিস—এখনো কান দুটো আমার ভোঁ ভোঁ কচ্ছে। চোখের সামনে ধুতরো ফুল দেখছি। বলে জহর চোখ দুটো বুজিয়ে আবার চেয়ে দেখলে।

—তুই বলে তাই এ যাত্রা সামলে গেলি কোন গতিকে, আমরা হলে বেমালুম কুপোকাৎ! উঠে আর পত্তি করতে হতো না। বাপ্—ওর নাম কি ঘুষি! ঘুষির কথা স্মরণ করে অনুপ প্রায় আঁতকে উঠলো।

অজিত এক গাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাবার চেষ্টা করছিল। মন্তব্য করলে, ব্যাটা ওস্তাদ খেলোয়াড়! অমন ঘাপটি মেরে চোরা-গোপালটি সেজে থাকে। তারা বললে না বিশ্বাস করবি—যেন ম্যাজিক! ভানুকে দেখলুম না—দেখলাম শুধু ঘুষি—পটাপট ঘুষি জহরের ওপর পড়ছে গদাম করে। দেখতে দেখতে চোখ দুটো আমার ছানাবড়া হ'য়ে গেল।

—ওকেই বলে হাতের কায়দা! কি বলিস অরুণ?

পাপুর কথার উত্তরে বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে অরুণ বললে, উঁ হুঁ—কিছু একটা ব্যাপার আছে। একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারলে মন্দ হতো না যে, কি খেয়ে ব্যাটার গায়ে এত শক্তি! আচ্ছা, এক কাজ কর দেখি অনুপ—ওরা কলেজ গেল কি না—একবার উঁকি মেরে দেখে আয় দেখি।

—যো হুকুম, সর্দার! বলে অনুপ একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জহর হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, কি জানি কেন ব্যাটাকে দেখলেই আমার রাগ হয়।

ঠাট্টার সুরে অজিত বললে, সাবিত্রীর সঙ্গে ভানুর আলাপের আগে—না পরে?

—না—না—ঠাট্টা নয়। যেদিন তাকে প্রথম দেখেছি—সেই দিন থেকেই কেমন একটা—

জহরের কথা শেষ হয়নি—দরজার ধার থেকে বলতে বলতে অনুপ ঢুকলো,

ওদের দরজার তালা বন্ধ! ভানুকে হ্যাঙচাতে হ্যাঙচাতে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে দেখে এলুম।

—ঠিক আছে। একটা ছেনি আর হাতুড়ি যোগাড় কর।

—একি কথা সর্দার! ছেনি হাতুড়ির কারবার এর আগে তো কোনদিন করিনি, কোথা থেকে জোগাড় করবো! বলে অনুপ চেয়ে রইলো অরুণের দিকে।

—নাঃ তোদের দিয়ে কিছুই হবে না। বলে অরুণ ঘর থেকে এক বেরিয়ে গেল।

—অরুণ কি ক্ষেপে গেল নাকি! ছেনি, হাতুড়ি নিয়ে কি করবে? বলে অজিত জিজ্ঞাসু নেত্রে জহরের দিকে চাইলো।

—তুই একটা বুদ্ধু! তালা ভেঙে ভানুদের ঘরে ঢুকবে। বললে জহর।

—তারপর? ম্যাও সামলাবে কে? যখন থানা পুলিস হবে—তখন?

—তখন দু' মাসের জেল আর নয় মাস তিনেকের ফাঁসী! আমাদের মধ্যে সব চেয়ে যদি কেউ ভীতু থাকে—তবে সে অজিত। বলতে বলতে এক হাতে একটা হাতুড়ি আর এক হাতে হাত খানেক লম্বা একটা লোহার পাইপ নিয়ে অরুণ ঘরে ঢুকলো।

—তা যা বলেছো। কিন্তু এ দুটি মাল কোথা থেকে গস্ত করলে?

হাতুড়িটা দেখিয়ে অরুণ বললে, এটি দিয়ে উনুনশালের কয়লা ভাঙা হয়। আর এটি আনলুম চৌবাচ্ছার নলের মুখ থেকে খুলে। এতেই আমাদের কাজ হ'য়ে যাবে। জহর কি শুয়ে থাকবি—না আমাদের সঙ্গে যাবি?

—আমি কি অজিত! ব'লে অতি কষ্টে উঠে বিছানার ওপর বসলো জহর!

—আয় সব্বাই। বলে অরুণ এগিয়ে গেল।

—তোরা দু'জন আয় তো আমার দু'পাশে। ওদের দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে জহরও চললো।

নিজের কাপুরুষ নাম খণ্ডন করতে অজিত আগেই পিছু নিয়েছিল অরুণের।

ভানুর ঘরের সামনে গিয়ে অরুণ এপাশ ওপাশ চেয়ে বললে, অনুপ আর

পাপু তোরা দু'জন দু'দিকে পাহারায় থাক। কাকেও আসতে দেখলে আগে থেকে সিটি মারবি। যা—

সর্দ্দারের নির্দ্দেশে অনুপ আর পাপু করিডোরের দু'দিকে চলে গেল! অজিতের সাহায্যে ঘরের তালা ভেঙে অরুণ ভিতরে ঢুকলো।

—এটা কিন্তু ঠিক বুদ্ধির কাজ হলো না অরুণ! তালা না ভেঙে অন্য চাবি দিয়ে খোলবার চেষ্টা করাই উচিত ছিল। তাতে কোন ফ্যাসাদের ভয় থাকতো না। বলে অজিত সমর্থন পাবার জন্য জহরের দিকে চাইলে।

—ও সব এখন গুলি মার! ব'লে জহর অজিতের কাঁধে ভর দিয়ে ভানুর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

—ছ্যাখ—ছ্যাখ—খুঁজে ছ্যাখ কি খেয়ে ব্যাটার গায়ে এত শক্তি! ব'লে অরুণ টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে বার করলে।

—ও টেবিলটা ভানুর নয়—সমীরদার। শুয়ে শুয়ে বললে জহর।

—আজ ওদের ড্রয়ার, সুটকেশ—যেখানে যা আছে—সব কিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবো। কাকেও রেহাই দেবো না। ব'লে অরুণ বিপুল উদ্যমে কাজে লেগে গেল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে সারা ঘরখানাকে ওরা তচ্‌নচ্‌ ক'রে ছেড়ে দিলে। চেয়ার উলটে, টেবিলের ড্রয়ার নামিয়ে, প্রত্যেক সিটের বিছানা ওলোট্‌-পালোট ক'রে, সুটকেশ ট্রাঙ্ক ঘেঁটে—সে এক লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড!

ভানুর সুটকেশটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ অজিত চীৎকার ক'রে উঠলো, পেয়েছি—পেয়েছি।

—দূর হতভাগা! গলা চেপে চেঁচা না! বলতে বলতে অরুণ এগিয়ে এলো।

একটা ঠোঙা তুলে ধরে অজিত বললে, সুটকেশটার ভেতর থেকে বেরুলো।

—তা তো বেরুলো, জিনিষটা কি দেখি?

—চালভাজা! ব'লে অরুণের হাতে অজিত ঠোঙা তুলে দিলে।

এক মুঠো চালভাজা গালে ফেলে অরুণ বললে,—মিইয়ে গেছে।

—সে কথা নয়। এই চালভাজাই হচ্ছে আসল মাল! মন্তোর দেওয়া—

বুঝলি ? দে—দে—জহরের গালে ছুটি দে ! ব'লে অজিত নিজেই ঠোঙা থেকে এক মুঠো চালভাজা নিয়ে জহরের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, নে—হাঁ কর।

—কিন্তু আমি কি চিবুতে পারবো ! চোয়াল যে নাড়তে পাচ্ছি না। গালে বেজায় ব্যথা। তোরা খেয়ে দেখ না।

—গনে ছটো চালভাজা মুখে ফেলে দেখ না—মন্তোরের জোরটা কতখানি।

—দে তবে। বলে জহত ভয়ে ভয়ে হাঁ করলে।

—কি রে অরুণ ! গায়ে একটু বল পাচ্ছিস ?

—হুঁ ! বলে অরুণ নিজের muscle ফুলিয়ে দেখিয়ে দিলে।

উৎসাহিত হ'য়ে অজিত জহরের দিকে চেয়ে বললে, আর তোর ?

—হুঁ—চালভাজার জোর আছে—এখন একটি ঘুষিতে আমি ভানুকে বেমালুম কুপোকাৎ করে ফেলতে পারি। নিয়ে আয় ব্যাটাকে আমার সামনে। বলে জহর উঠে বসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু না পেরে আবার বিছানায় কাৎ হ'য়ে পড়লো।

—এ যে মন্তোর দেওয়া চালভাজা সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কঠোর মন্তব্য করলে অরুণ।

—চালভাজার ঠোঙাটা তাহলে সাফ্ করে দেওয়া যাক্ !

—সে কথা আর বলতে ! চল্—আর বেশীক্ষণ গুলতুনি পাকানো এখানে ঠিক নয়। জাল গুটিয়ে সরে পড়া যাক্। নে জহর কাঁধে ভর দে ! বলে অরুণ জহরের সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেল তার পাশে।

—হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন দরজাটা বন্ধ করে দিলে। অথচ যে বন্ধ করলে তাকে দেখা গেল না। মনে হলো—কাণ্ডটা বাতাসের। অজিত এসে দরজা খুলতে গেল। কি সর্ব্বনাশ ! এ যে খোলে না ! গায়ের জোরে দরজা ভিতর থেকে টেনে খোলবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না।

অরুণ বললে, কি হোল—খোল।

বিব্রত অজিত বললে, আচ্ছা মুস্কিল তো ! এ যে খোলে না।

—সর—সর—টেবিলটা ধরে একটু দাঁড়াতো, জহর ! ব'লে অরুণ এসে হেলা-

ভরে আঙটা ধরে টান দিলে। খুললো না দরজা। গায়ের আর খানিকটা জোর—আরো খানিকটা—পুরোপুরি, কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না। হায়রান হ'য়ে গেল অরুণ। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, তাইতো রে—হলো কি!

—চালভাজার শক্তি এরি মধ্যে ফুরিয়ে গেল, নাকি!

—দে তো আর দু'টি চালভাজা। ব'লে অরুণ চালভাজার ঠোঙাটা অজিতের হাত থেকে নিয়ে এক মুঠো মুখে পুরে দিয়ে ঠোঙাটা পকেটে রাখলে।

—আয় তো অজিত—এবার দু'জনে মিলে দেখি। বলে অরুণ আর অজিত দু'জনে মিলে দরজা নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করে দিলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হেঁচকা-হেঁচকি, টানাটানিতে ওদের কালঘাম ছুটে গেল।

ওরা পাপু আর অনুপকে ডেকে দরজার সামনে থেকে ধাক্কা দিতে বললে। ধাক্কাও তারা দিলে কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দরজা যেমন বন্ধ হয়ে গেসলো—তেমনি বন্ধই রইলো।

—বাপ্—এ একেবারে রাম আঁটন এঁটেছে।

—তাতো আঁটলো—কিন্তু এখন উপায়?

—বাইরে থেকে অনুপ আর পাপু সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো ঈষৎ চাপা গলায়, ভানু! ভানু! ভানু আসছে।

—এ্যাই সেরেছে! বলে জহর ভানুর সিটের ওপর বসে পড়লো।

অরুণ গুম খেয়ে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছলে। অজিত ঘরের একটা কোণ আশ্রয় করে আরো বেশী ঘামতে সুরু করলে।

কলেজ এখনো শেষ হ'তে ঘণ্টাকয়েক দেরী। দেবুদার টেলিফোন পেয়ে সে ক্লাস করতে করতে ছুটে এসেছে। দেবুদা যে তাদের আটকে রেখেছে—এ খবর সে আগেই পেয়েছে।

ভানু এসে দেখলে—দেবুদার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। ঘরের তালা ভাঙা, অরুণের দল ঘরের মধ্যে বন্দী। জানালা দিয়ে ঘরের অবস্থা দেখে চোখ ফেটে তার কান্না এলো! সে তীব্র কণ্ঠে বললে," তালা ভেঙে কার পারমিশনে ঘরে ঢুকেছেন আপনারা?

—তালা ভাঙার জন্য কি আবার কোন দিন কারুর পারমিশন দরকার হয়? দরজাটা খুলে দিন—আমাদের কারোর এখনো স্নান-খাওয়া হয়নি।

—ঘরে ঢোকবার সময় তো আমায় ডাকেন নি দরজা খুলে দিতে!

ঘরের কোণ থেকে অজিত বেরিয়ে জানালার ধারে এসে বললে, ভুল হয়ে গেছে, ব্রাদার, এবারের মত দরজাটা খুলে দিয়ে আমাদের উদ্ধার করুন, ভবিষ্যতে আর এমন ভুল হবে না। দরজাটা খুলতে—বিশ্বাস করুন, আমি আর অরুণ হিম্‌সিম্ খেয়ে গেলুম। বাতাসে—যাকে বলে—বজ্র আটুনি এঁটেছে।

—যাচ্ছি আমি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের কাছে।

—কি মুস্কিল! আরে মশাই—যাবার আগে দরজাটা খুলে দিয়ে যান! কাকুতিভরা কণ্ঠে বললে অজিত।

—বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের?

—কষ্ট হবে না! এমন অবস্থায় আপনি পড়লে—কেঁদেই ফেলতেন। ক্ষিদেয় নাড়ি চো চোঁ কচ্ছে। সকাল থেকে কাপ কয়েক চা ছাড়া পেটে একখানা শুকনো টোষ্টও পড়েনি। Please!

—Just a minute! ব'লে ভানু চলে গেল।

ওরা ভাবলে—ভানু নিশ্চয় একটা মিস্ত্রী ডাকতে গেছে দরজা খোলাবার জন্য। কিন্তু একটা মিনিট রবারের মত লম্বা হ'তে চললো তবু না আছে ভানুর দেখা আর না আছে মিস্ত্রীর।

সর্দ্দার অরুণের তাড়নায় অনুপ আর পাপুর প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। কোথায় পাবে ভানুর দেখা! সে এখন নিশ্চিন্ত মনে ক্লাস করছে। বন্দীদের পালাবার ভয় নেই দেবুদা যখন আছে।

ক্লাস শেষ হলো সেদিনের মত। ভানু গেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের কাছে।

অনুপ বন্দীদের উদ্দেশে বললে, সমীরদা আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার আবৃত্তি শোনা গেল করিডোরের ওপর—

"বলে দাও বাতি না জ্বালায় আজি
আনন্দের নাহি সীমা।
আজ প্রেয়সীর মুখ চন্দ্রের
আনন্দ পূর্ণিমা॥"

দরজার তালা খুলতে গিয়ে সমীর দেখলে ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। কি মুস্কিল! ভানু অথবা পশু অথবা দু'জনেই ঘরে দরজা দিয়ে কি কচ্ছে। দরজায় ধাক্কা মেরে সমীর বললে, দরজা খোল!

অজিত জানালার ধারে এগিয়ে এসে বললে, খোলা যে যাচ্ছে না! ভানুবাবু আমাদের বন্দী করে রেখে গেছে।

—কই—দরজায় তালা-টালা তো কিছুই দেখছিনা? বলে সমীর জোরে আর একবার দরজায় ধাক্কা মারলে। দরজা কিন্তু অ—ট—ল, অ—চ—ল!

তালা খোলবার মিস্ত্রীর বদলে ভানুর সঙ্গে আসছেন—হোষ্টেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট।

অজিত বললে, দেখলে অরুণ ভানুবাবুর কাণ্ড! এত বড় বিশ্বাসঘাতক আর দুনিয়ায় নেই। ফার্স্ট হলেই ভদ্রলোক হওয়া যায় না।

—তুই দেখে নিস জহর। আজ থেকে ওকে আমরা একঘরে ক'রে ছাড়বো, বলে অরুণ নিজের হাতের ওপর সজোরে তাল ঠুকলে।

দরজার বাইরে ভানুর গলা শোনা গেল। এই দেখুন Sir, আমার ঘরের তালা ভেঙে এঁরা ঘরে ঢুকেছেন! এঁরা চান—আমি এ হোষ্টেল ছেড়ে পত্রপাঠ-এখান থেকে বিদায় হই।

ভানু দরজায় হাত দিতেই দরজা খুলে গেল।

—ট্রেসপাসারস্! ইউ আর অল্ ট্রেসপাসারস্! হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ধীরাজ দাস।

—এই চালভাজা, Sir!

—চালভাজা! হোয়াট ডু ইউ মিন্? বিস্ময়ভরা কণ্ঠে ধীরাজবাবু তাদের দিকে চাইলেন।

—কি খেয়ে ভানুবাবুর ঐ কথানা জির-জিরে হাড়ে এত শক্তি—তাই অনুসন্ধান করতে Sir—আমরা এই ঘরে ঢুকতে বাধ্য হয়েছি।

—বাট্ দিস্ ইজ্ এ গ্রেভ্ অফেন্স। না বলে লুকিয়ে অন্যের ঘরে ঢোকা কি উচিত!

অরুণ নিজের দলকে সমর্থন করে বললে, ব'লে ক'য়ে ঢুকলে এই চালভাজার সন্ধান তো পেতাম না, Sir!

—চালভাজা—চালভাজা কচ্ছো, চালভাজার ভেতর আছে কি? ওর মধ্যে কি তোমরা আবিষ্কার করলে?

—এই মন্ত্রপূত চালভাজা খেয়েই Sir—ভানুবাবুর গায়ে এত শক্তি। এরই সাহায্যে কাল ভানুবাবু আমায় বক্সিঙে হারাতে পেরেছেন। আজও Sir আমি চোখে সরষে ফুল দেখছি।

জহরের আক্ষেপ শুনে ধীরাজবাবু আর তাঁর গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে পারলেন না—হেসে ফেললেন। বললেন, তোমরা সব এক একটি বদ্ধ পাগল। ভবিষ্যতে এ ধরণের পাগলামি করলে—জেনে রেখো—তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। এই তোমাদের প্রথম অপরাধ হিসাবে আমি ক্ষমা করলাম।

—যত সব বাজে ঝামেলা! ব'লে সমীর জামাকাপড় পরা অবস্থাতেই তার সিটের ওপর শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়েই বললে, কার কাছে সিগ্রেট্-ফিগ্রেট্ কি আছে—একটা-আধটা ঝাড়ো না।

কারো মুখে কোন কথা নেই। গমনোদ্যত অরুণদের উদ্দেশে সমীর বললে, তোমরা একটা ভুল করেছো, ব্রাদার্স! অনর্থক আটক হ'য়ে হাজত বাস না করে ঐ মন্ত্রপূত চালভাজা সব একমুঠো করে গালে পুরে স্রেফ্ গায়ের জোরে দরজা খুলে হাওয়া হ'য়ে গেলেই পারতে! ভানুবাবুই বল আর ধীরাজবাবুই বল—তোমাদের টিকির সন্ধানও পেতেন না।

সখেদে অজিত বললে, চেষ্টার আমরা ত্রুটি করিনি, দাদা!

—চালভাজার গুণ তো তাহলে হাতে-নাতে দেখছি—বেগুণ হ'য়ে গেল!

অরুণ বিস্ময়-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, তবে কি সব ভুয়ো ?

এতক্ষণে ভানু মুখ খুললে, বিলকুল !

জহরের কণ্ঠে হতাশার সুর, দেন ইট্ ইজ এ মিষ্ট্রী !

—এইবার তাহলে সব নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে যাও। চালভাজা সমস্যার এখানেই সমাধান হ'য়ে গেল। বাকি চালভাজাগুলো তেল আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে না মেখে —বুজেছো কিনা, তারপর আদার রস না দিয়ে কাপ দুয়েক করে গরম গরম চা— ওরে বঁধুয়া! বঁধুয়া! ডাকতে ডাকতে বিছানা ছেড়ে উঠে সমীর তার ড্রয়ার খুলে টাকা একটা বার করলে।

বঁধুয়া এসে মিলিটারী কায়দায় একটা সেলাম দিয়ে বললে, সার!

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়, অফিস ঘরে বসে হোষ্টেল সুপারিনটেনডেণ্ড ধীরাজবাবু নিজের মনে কাজ ক'রে চলেছেন। ঘড়িতে দু'টা বাজার সাঙ্কেতিক ঘণ্টা পড়লো। মনে হলো ওষুধ খাবার কথা, পাশেই তাঁর কোয়ার্টার। ওষুধ খাবার জন্য ধীরাজবাবু তাঁর কোয়ার্টারে গিয়ে ঢুকলেন।

অদৃশ্য দেবু এসে ঘরে ঢুকলো, ধীরাজবাবুর চেয়ারে বসে দেবু তাঁরই সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরিয়ে ফেললে, অরুণের দলকে বন্দী করে দিলটা তার দরিয়া হ'য়ে গেছে। ব্যাটাদের ভারি জব্দ করা গেছে—! নিজের ভাবে নিজেই মসগুল হ'য়ে দেবু সিগারেট টেনে চলেছে।

—হু! হু ইজ দেয়ার ?

ধীরাজবাবুর সাড়া পেয়ে দেবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশে সরে দাঁড়াল।

বাতি তখনও জ্বালা হয়নি, ঘরটা আলো আঁধারে ভরে গেছে, ভিতরের লোককে ঠিক স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না।

—কে সিগারেট খাচ্ছে ?—কে ? বলতে বলতে ধীরাজবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।

লোক দেখা যাচ্ছে না, শুধু একটা জলন্ত সিগারেট শূন্যে ঝুলছে। ধীরাজবাবু

সুইচে হাত দিয়ে বাতি জ্বালাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে জলন্ত সিগারেটটা ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে যেন নীচেই নেমে গেল।

আলোটা জ্বেলে ধীরাজবাবু চোখদুটো রগড়ে নিয়ে চারদিক বেশ ভাল করে দেখে নিলেন। কিছুই বুঝতে পারলেন না অথচ নিজের চোখকেই বা অবিশ্বাস করেন কেমন করে! নিজের মনে বিড় বিড় করে তিনি বলতে লাগলেন,—আমি কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখলাম! ইজ্ ইট্ এ ড্রিম! নাঃ কালই একবার ডাক্তার সেনের কাছে যেতে হবে, নিশ্চয় মাথায় কোন গণ্ডগোল হ'য়েছে।

মাতালের মত টলতে টলতে গিয়ে ধীরাজবাবু তাঁর ইজিচেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন।

কলিকাতা থেকে মাইল কয়েক দূরে। নদীর চরে একটা বিরাট পড়ো বাগান। বাগানের মধ্যে একটা বিরাট ভাঙা মন্দির—শিব মন্দির। মন্দিরটা আজও আছে কিন্তু যাঁর মন্দির তিনিই শুধু নেই। বাগানের এক পাশে নদী ও অন্য ধারে সহরে যাবার রাস্তা।

বাগানের পাড় থেকে প্রশস্ত সিঁড়ি নেমে গেছে নদী গর্ভে।

এখানে এসেছে আজ কলেজের ছেলেমেয়েরা পিক্‌-নিক্ করতে। চত্বরের একাংশে রান্না চাপান হ'য়েছে। রান্নারভার নিয়েছে হোষ্টেলের উড়ে ঠাকুর আশু।

নদীর চর, ঘাটের সিঁড়ি—পাড়ের চত্বর—সারা বাগানে ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে দলে দলে। বঁধুয়া সকলের মন জুগিয়ে ছুটোছুটি কচ্ছে বখশিষের লোভে। সারা স্থানটা জুড়ে মেলা বসে গেছে তরুণ-তরুণীর। হাসি, কথা, গানে মুখর হ'য়ে উঠেছে চারিধার। চায়ের কাপ, সরবতের গ্লাস, টোষ্ট, মামলেট, ফলের ডিস ফিরছে হাতে হাতে।

নদীর চরে অপেক্ষাকৃত নিরালা স্থানে বসে বসে গল্প কচ্ছিল ভানু আর সাবিত্রী।

—বেশ তো আমাদের বাড়ী যাওয়া-আসা কচ্ছিলেন—হঠাৎ বন্ধ করলেন কেন? ব'লে সাবিত্রী জিজ্ঞাসু নেত্রে ভানুর দিকে চাইলে।

নিজে বাঁচতে হলে আর তোমাকে বাঁচাতে হলে—আপাতত ও বাড়ীমুখো আর না হওয়াই ভালো, বুঝলে কিছু?

—কিছুই বুঝলাম না, মাসীমা আপনাকে অত ভালবাসেন—

হাসলে ভানু। বললে, রাগ করো না, তোমার মাসীমার ভালবাসা আর জাতি বিশেষের মুরগী পোষা—দুই সমান।

—মাসীমার আপনি নিন্দে কচ্ছেন!

ভ্রূভঙ্গি করে ভানু বললে, রাধামাধব! তিনি আমাকে জামাই করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন—আর আমি তাঁর নিন্দে করবো। অত নিমকহারাম আমি নই। ওকি—অমন করে হাসছো কেন? তুমি যা ভেবে হাসছো—সে গুড়ে বালি!

—তার মানে!

—তোমার কোনই চান্স নেই। মাসীমা যমুনার সঙ্গে অর্থাৎ নিজের মেয়ের সঙ্গে শ্রীমান ভানুর বিয়ে দিতে চান। তোমায় বড় জোর করতে পারেন মিত-কনে। ঢুকলো - বলি মগজে কিছু কি ঢুকলো? বলে ভানু সাবিত্রীর বেণীটায় একটা টান দিলে।

হঠাৎ দু' প্লেট মাংস যেন বাতাসে উড়ে এলো তাদের দু'জনের সামনে।

—তোমাদের মাংস নিয়ে এলুম। বললে অদৃশ্য দেবু।

বাতাসকে কথা বলতে শুনে সাবিত্রী চারদিকে চেয়ে দেখে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললে, কে কথা বললে?

সাবিত্রীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে যেন বাতাসের উদ্দেশ্যেই ভানু বললে, মাংস এনেছো—ভালোই করেছো তবে আপাততঃ তুমি এখান থেকে বিদায় হও।

—যথা আজ্ঞা, জাঁহাপনা!

ভানুর গায়ের ওপর প্রায় লেপটে পড়লো সাবিত্রী। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গেল। জিব ভেতর থেকে টেনে ধরেছে। দিন-দুপুরে একি তাজ্জব ব্যাপার! সাবিত্রী দু'হাত দিয়ে ভানুর একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরলে। বেচারা

এধারে ওধারে চায় আর কাকুতিভরা ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বলে, কার সঙ্গে কথা বলছেন? বলুন না—বলুন না কার সঙ্গে কথা বলছেন?

সাবিত্রীর দু'কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে ভানু বললে, সরে বসো, দিন দুপুরে জাপটা-জাপ্‌টি করতে দেখলে ওরা সব কি ভাববে বলতো?

—যে যা ভাবে—ভাবুক! ভাবুক! কার সঙ্গে কথা বললে—আগে বল, ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেছে। বলতে বলতে সাবিত্রী একটু সরে বসলো বটে তবে ভানুর হাত ছাড়লে না।

—ভয়ে গলা শুকিয়ে গিয়ে থাকে—প্লেট থেকে খানিকটা গরম ঝোল চুমুক দিয়ে খেয়ে নাও। নাঃ! বি-এ-ই পাশ কর আর বিলেতেই যাও—তোমরা যে মেয়েছেলে সে-ই মেয়েছেলে। যার সঙ্গে কথা বললুম—সে ভূত নয়—মানুষ! জল-জ্যান্ত মানুষ—এই তোমার আমারই মত।

—মানুষ! কৈ - চোখে তো দেখলাম না!

—সব জিনিষ কি চোখে দেখা যায় অথচ এই বিজ্ঞানের যুগে বিশ্বাস করতে হয়!

সাবিত্রী অবাক-বিস্ময় নেত্রে ভানুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, একি প্রহেলিকা! ভানু কি যাদু জানে! অথচ বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে যে যুক্তির সে অবতারণা করলে তাকে খণ্ডন করা সহজসাধ্য নয়।

—এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না! প্রমাণ না পেলে যুক্তি মানতে মন চায় না—এই তো? ঐ—সামনে চেয়ে ছাখো! কি দেখছো—?

—কতগুলো পায়ের ছাপ।

—ভালো করে ছাখো—ঐ ছাপগুলো ক্রমশঃ এগিয়ে এসেছে মাংসের ডিসের কাছ বরাবর। অতএব—কি বোঝা গেল? যে অদৃশ্য জীব মাংসের ডিস নিয়ে এসেছে—ওগুলো তারই পায়ের ছাপ। বালির ওপর ঐ সুস্পষ্ট পায়ের দাগ যদি অন্য কোন জীবের না হ'য়ে মানুষের বলে মনে হয়—তাহলে যে এসেছিল সে নিশ্চয়ই মানুষ! ভূতের আর যাই থাক—অন্ততঃ পায়ের ছাপ থাকে না—কারণ, শোনা যায়—ভূত অশরীরি।

—কি আশ্চর্য্য লোকটাকে চোখে দেখা গেল না অথচ পায়ের ছাপ সুস্পষ্ট!

—আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, বিজ্ঞানের যুগে সবই সম্ভব! নাও—খেতে সুরু কর। কোল্ড মিট আর ওল্ড ওয়াইফ—বোথ ইন্‌জুরিয়াস টু হেল্‌থ। ব'লে এধার ওধার চেয়ে এক টুকরো মাংস ভানু সাবিত্রীর মুখে পুরে দিলে।

—আঃ কি করেন! কেউ যদি দেখে ফেলে! কৃত্রিম ঝঙ্কারে বললে সাবিত্রী।

—জলজ্যান্ত একটা বেটাছেলের গায়ে দিনদুপুরে ভুতের ভয়ের ছল করে ঢলে পড়বার আগে সে খেয়াল করা কি মিসিবাবার উচিত ছিল না!

—যান্—বাজে বকবেন না। আমি বুঝি ছল ক'রে ঢলে পড়েছিলুম?

—তাহলে বুঝতে হবে—তুমি ভূত বিশ্বাস কর!

—মোটেই না! জোর গলায় বললে সাবিত্রী।

কটাক্ষ করে ভানু বললে, ভূতও বিশ্বাস করনা আবার ছল করেও ঢলে পড়োনি—তাহলে ঢলে পড়াটার মূল উদ্দেশ্যটা কি?

—আমি জানিনা। ব্যস্—আর কথা আছে?

—কি মুস্কিল! খেতে খেতে ঝগড়া করনা। ব'লে স্মিতহাস্যে ভানু আর এক টুকরো মাংস ওর মুখে পুরে দিলে।

মাংসের টুকরোটা মুখে নিয়ে সাবিত্রী ধমক দিয়ে বললে, আবার!

—এক্সকিউজ মি, প্লিজ!

—আমি বুঝি ঝগড়া করি?

—রাধামাধব। ঝগড়া করা—মানে পায়ে পা তুলে ঝগড়া করা মেয়ে জাতের কুষ্ঠিতে লেখেনি—, ঝগড়ার মুল হচ্ছে—এই জাত! ব'লে ভানু নিজের বুকে বাঁ হাতটা চেপে ধরলে।

—জাত তুলে কথা বলছেন যে!

—জাত অবশ্য তুলেছি—, তবে প্রশংসা করেছি তোমার জাতের আর নিন্দে করেছি আমার অর্থাৎ এই পুরুষ জাতের।

—আমি সব বুঝি—বুঝলেন!

—বি-এ পড়ছো—বুঝবে বইকি! আহা-হা মাংসর সারাংশই হচ্ছে ঝোল ঝোলটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে নাও। ধরবো—প্লেটটা আমি ধরবো?

—ধন্যবাদ! ব'লে সাবিত্রী ছ'হাত দিয়ে প্লেটটা মুখে তুলে ধরে চুমুক দিলে।

নিজের রুমালটা এগিয়ে ধরে ভানু বললে, সারা মুখময় ঝোলের দাগ লেগে গেছে—বেশ করে মুছে ফ্যালো।

সাবিত্রীর তথাকরণ।

—মাংসের ঝোলের সঙ্গে লিপ-ষ্টিকের টক্-টকে রঙটাও খেয়ে ফেললে? ব'লে ভানু মুখ মচকে হাসতে লাগলো।

—দেখুন—ভাল হচ্ছেনা, কিন্তু। ও, এইজন্যে আমার ঝোল খাওয়াবার অত জেদাজেদি! আচ্ছা দুষ্ট লোক তো! ব'লে সাবিত্রী ছোট্ট একটা চিমটি কাটলে ভানুর গায়ে।

ছ'জনেই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো।

—এইবার বলুন—ঐ অদৃশ্য লোকটির ইতিহাস। লোকটি কে—কি করেই বা ও অদৃশ্য হলো?

—আজই শুনতে চাও?

—হ্যাঁ—আজই।

বলবার আগে তাকে বিশেষ করে সাবধান করে দিলে—ঘটনাটা গোপন রাখার জন্য। ভানু তার দেবুদার অদৃশ্য হবার ইতিহাস গোড়া থেকে বলতে স্থরু করলে সাবিত্রীর কাছে।

—গল্প বলতে হয় বেশ জমিয়ে? অমন খাপছাড়া খাপছাড়া কথার মধ্যে রস-কস পাওয়া যায় না। গল্প বলতে জানার কায়দাই হচ্ছে একটা আর্ট!

সাবিত্রীর বেণীতে একটা টান দিয়ে ভানু বললে, ভুল কচ্ছো [illegible], এটা গল্প হলেও সত্যি, এর মধ্যে আর্টের বালাই নেই।

—আচ্ছা বাবু, হার মানছি। কিন্তু গল্পটা একটু স্পষ্ট করে বলবেন তো! এ যেন ঠিক—"আমার কথাটি ফুরুলো আর নটে গাছটি মুড়ুলো"!

—ওঃ জ্যাঠা মেয়েছেলে আমি ছ'চক্ষে দেখতে পারি না। শোন—বেশ স্পষ্ট করেই বলছি। তারপর কি হলো জানো—রাগের মাথায় অদৃশ্য হবার ওযুধটা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেললে দেবুদা। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল অদৃশ্য।

চোখ ছুটো বড় বড় করে সাবিত্রী বললে তারপর!

—তারপর আর কি! দে-মার—দে-মার! মারের চোটে বাড়ীওলা শেষ পর্য্যন্ত তার দলবল নিয়ে হাওয়া হ'য়ে গেল।

—কার্জটা কিন্তু ভাল করেনি দেবুদা। এখন উপায়?

—উপায়! কিসের উপায়?

—রক্তমাংসের দেহ আবার ফিরে পাবে কি করে?

হাসলে ভানু। বললে, কি করে ফিরে পাবে তা জানিনা, তবে ছ'বছর পরেই হোক আর পাঁচ বছর পরেই হোক—ফিরে একদিন পাবেই।

—আচ্ছা, তাড়াতাড়ি দেহটা ফিরে পাবার কি কোন ওষুধ নেই? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে সাবিত্রী।

—হয়তো আছে—আর নয়তো নেই। মোট কথা—দেবুদা সে ওষুধের কোন খোঁজ খবর রাখে না। কথা কটা উদাস কণ্ঠে ব'লে ভানু একটা সিগারেট ধরাতে দেশলাই জ্বাললে। সাবিত্রী ফুঁ দিয়ে কাঠিটা নিভিয়ে দিলে।

পলকবিহীন নেত্রে ভানু সাবিত্রীর দিকে চেয়ে দেখলে—অর্থাৎ এরকম তো কথা ছিল না, কাজটা কি ভাল হচ্ছে?

—বিশ দিন বলেছি—ও ছাই আমার সামনে খাবেন না, তবু কি কথাটা আপনার কানে যায় না?

অর্থপূর্ণ কটাক্ষে ভানু বললে, কথাটা যেন—অন্ হার ম্যাজেস্‌টি'স্ সার্ভিসের মত শোনালো।

—ডোণ্ট বি সিলি!

—আচ্ছা, সিলি না হয় নাই হলাম, কিন্তু আমি সিগারেট খাই বা না খাই—তাতে অন্যের কি যায় আসে! তা ছাড়া—তুমি আমার এমন মান্যবর খুড়শ্বশুর নও যে তোমার সামনে সিগারেট খাওয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ!

—আহা-হা—আমি কি তাই বলেছি। সিগারেটের ধোঁয়া আমি সহ্য করতে পারি না।

—গন্ধ নাকে যেতে যেতে ক্রমশঃই সহ্য হ'য়ে আসবে। ব'লে ভানু ওর দিকে আড়াল হ'য়ে একটা সিগারেট ধরালে। সাবিত্রী আচম্বিতে ভানুর মুখের ধরানো সিগারেট নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

নদীর পাড়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে যমুনা এতক্ষণ ওদের লক্ষ্য কচ্ছিল। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখে তার সন্দেহের যেটুকু বাকি ছিল—তাও পূর্ণ হ'য়ে গেল। এতদিনে সে পরিষ্কার বুঝতে পারলে যে তার আর সত্যিই কোন আশা নেই। সাবিত্রী তার সম্পূর্ণ আয়ত্বের মধ্যে এনে ফেলেছে ভানুকে। ওদের প্রেম-তরুর শিকড় নেমে গেছে অনেক দূর। হায়রে অদৃষ্ট! আসল গাছ ছেড়ে শেষে ভানু কিনা আশ্রয় করলে একটা পরগাছা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—ব্যাটাছেলে জাতটার ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিলে! আর সাবিটাকেও বলি—পরের খেয়ে পরে যে মানুষ—সে কিনা প্রেম করে! লজ্জা করে না তার প্রেম করতে! আজ যদি ওকে দূর করে দেওয়া হয়—কোথায় থাকবে তখন ওর প্রেম করার বিলাসিতা! পড়াশোনা যাবে চুলোর দোরে—পঁচিশটাকার স্কুল-মাষ্টারির জন্যে হন্যে হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। সাবিটা কিনা সব কিছু জেনে শুনে শেষ পর্য্যন্ত এই করলে। যমুনার অন্তরের বাসনা তো সাবিত্রীর অজানা নয়।

রাগে, দুঃখে, অন্তরের জ্বালায় যমুনা অন্যমনস্কভাবে নুয়ে পড়া গাছের ছোট্ট ডালের পাতাগুলো একটার পর একটা ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো ওদের অলক্ষ্যে ওদেরি দিকে চেয়ে।

—এই যে মিস চ্যাটার্জি!

চমকে উঠে যমুনা পিছন ফিরে দেখলে—অনুপ দাঁড়িয়ে ঠিক তার পিছনে—একেবারে গা ঘেঁসে। অনুপকে দেখে সর্বাঙ্গ তার জ্বলে গেল। বেশ কিছুদিন হলো—ছেলেটা তার পিছু নিয়েছে। ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠবার জন্য চেষ্টার ওর ত্রুটি নেই। কালীঘাটের জীব বিশেষের মত তাড়া দিলেও দূরে সরে যায় না, খেতে

পাবার লোভে ক্রমশঃই কাছে এগিয়ে আসে—ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়ায় আশেপাশে।

একে এড়াবার কত চেষ্টা করেছে যমুনা কিন্তু পেরে ওঠেনি। এ যেন একেবারে নাছোড়বান্দা! ছেলেটা কি বুঝেও বোঝে না যে—যমুনা তাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে!

একগাল হেসে ক্যাবলার মত অনুপ বললে, আপনি একা এখানে আর আমি আপনাকে পাগলের মত খুঁজে খুঁজে—

—কোন দরকার আছে আমার সঙ্গে?

—মানে—মানে—মানে আপনার সঙ্গে নিরালায় একটা জরুরী কথা ছিল। ব'লে অনুপ ঘাড় চুলকাতে সুরু করলে।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে যমুনা বললে, আমি এখন ব্যস্ত আছি।

সখেদে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে করুণকণ্ঠে অনুপ বললে, এখানেও ব্যস্ত!

—হ্যাঁ—ব্যস্ত!

—সবাই সবার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলছে—, শুধু আপনি আর আমি—

—শুধু শুধু বিরক্ত করবেন না—, যান দেখি এখান থেকে!

—তাড়িয়ে দিচ্ছেন!

যমুনা নীরবে নিজেই দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

মেনী বেরালের মত পা টিপে টিপে যমুনার কাছে গিয়ে অনুপ কাকুতিভরা কণ্ঠে বললে, যদি অভয় দেন তো একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি!

—অভয় দেবার কিছু নেই আর আমাকে আপনার জিজ্ঞাসা করারও কিছু থাকতে পারে না। অযথা আমায় বার বার বিরক্ত করবেন না।

—কিন্তু—কিন্তু, আচ্ছা—আপনি আমাকে কেন এরকম এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন—বলুন তো!

হঠাৎ নদীর চরের ওধার থেকে চিৎকার, চেঁচামেচি, একটা বিশ্রী গণ্ডগোল শোনা গেল। যমুনা ক্ষিপ্রপদে সেই দিকে এগিয়ে গেল—বেচারা অনুপের দিকে তার একবার ফিরে চাইবারও সময় হলো না।

ওদিকে তখন সবাই খেতে বসেছে; খেতে খেতে চলেছে চেঁচামেচি, হট্টগোল। মাংসে অত্যধিক পরিমাণে নুন বেশী হওয়ায় সবাই মারমুখী হ'য়ে উঠেছে হোষ্টেলের উড়ে ঠাকুর বেচারা আশুর ওপর।

—সত্যি, এ একবারে খাবার বাইরে। জলে ধুয়েও মুখে দেওয়া যাচ্ছেনা।

—নুনে একবারে পুড়িয়ে ফেলেছে, ব্যাটা!

অজিত হাত ধরে টেনে রাখতে পারছে না অরুণকে, অরুণের সৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে —আশুকে মেরে ফাটিয়ে ফেলা। সে আস্ফালন করে বলছে, ছেড়ে দেনা আমাকে! মারি ব্যাটাকে টেনে এমন একটা রদ্দা যে, যাক ব্যাটা ওর বাপের নাম ভুলে।

আশু অপেক্ষাকৃত দূরত্ব বজায় রেখে বলছে, মু'তো—মু'তো—মু'তো—

কে একজন বলে উঠলো, তোমার গুষ্টির পিণ্ডি তো।

—মু'তো ঠিক্ মত লবণ দিউথিলা।

সমীর উঠে এসে আশুর দাড়ি ধরে সুর করে বললে,

"সই কি আর কহিব আমি!
জনমে জনমে জীবনে-মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি।"

জহর উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, ব্যাটার টিকি কেটে নাও।

সঙ্গে সঙ্গে পশুপতি তরকারি কোটা বঁটিটা ওধার থেকে তুলে নিয়ে ছুটে এলো আশুর দিকে। বাঁ হাতে টিকিটা চেপে না ধরে আশু নদীর চরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীর জলে, ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে সে একবার পিছন ফিরে চেয়েও দেখলে না যে—পশু বঁটি নিয়ে তখনও তাকে তাড়া করে আসছে কিনা।

সমীর বললে, ব্যাটা সাঁতার জানে তো?

—ঐ খ্যাথনা—সাঁতরে নদীর ওপারে গিয়ে উঠেছে। কি যেন জোড় হাত করে আমাদের দিকে চেয়ে বলছে রে?

বাতাসে আশুর আর্ত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, দোহাই—দোহাই পরভু জগড়নাথ —দোহাই—

—আশুর ধারণা যে বাবুরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে এখুনি তার টিকি কাটতে আসবে।

মুখটা কাঁচু-মাচু করে অনুপকে একধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সমীর বললে, কি ব্রাদার! খেলে না যে?

—মনটা ভাল নেই।

—কে আবার মন খারাপ করে দিলে! কোন নারী-ঘটিত ব্যাপার নয় তো? আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি—আমার কাছে খুলে বল!

কাষ্ঠ হাসি হেসে অনুপ বললে, কি যে বলেন, সমীরদা!

—খাওয়ায় অরুচি ধরে গেল! উহুঁ—ব্যাপারটা যেন কেমন ঘোরালো ব'লে মনে হচ্ছে! এই যে মিস্ চ্যাটার্জি—আই মিন্ যমুনা দেবী! আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

—ঐ ওদিকে! ঔদাস্যভরা কণ্ঠে বললে যমুনা।

—আপনাকে ত খেতে দেখলাম না আর আপনার সিষ্টার—আই মিন্ সাবিত্রী দেবীকেও খেতে দেখলাম না। খাওয়ার ওপর আপনাদের সবার এত বিতৃষ্ণা কেন বলুন তো!

—যা মাংস রাঁধিয়েছেন—ওকি আর কেউ মুখে দিতে পারে!

—মুখে দিয়ে বলছেন—না—না দিয়েই?

হেসে ফেললে যমুনা।

—আচ্ছা, ভানুবাবুকে তো কৈ দেখছি না? ব'লে সমীর জিজ্ঞাসু নেত্রে যমুনার মুখের দিকে চাইলে।

দূরে সাবিত্রী আর ভানুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে যমুনা।

—ওঁদের অত্যন্ত ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে! আজও কিন্তু আমি ভেবে পাইনা যমুনা দেবী যে, মানুষের আগে পেট—না আগে প্রেম!

যমুনা সমীরের কথা বলার ধরণে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে লাগলো।

নদীর চরে উঠলো হৈ—হৈ হট্টগোল। অভয় পেয়ে আশু সভয়ে নদীর ওপার থেকে সাঁতরে এপারে ফিরে আসছে। এ-ই ব্যাপার।

—সন্ধ্যা বেলায় বেচারার কি দুর্ভোগ বলুন তো? সহানুভূতি ভরা কণ্ঠে ভানুর দিকে চেয়ে বললে সাবিত্রী।

—কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি তা বুঝলে?

সাবিত্রী নীরবে অর্থপূর্ণ চোখে ভানুর দিকে চাইলে।

—আমাদের মাংস কি নুনে পোড়া হ'য়েছিল?

—কই—নাতো। আমার মুখেতো একটুও নুন লাগেনি।

—তাহলেই বোঝ—ব্যাপার একটা কিছু ঘটেছে!

—ভুলে হয়তো ঠাকুর দু'বার নুন দিয়ে ফেলেছে।

স্মিতহাস্যে ভানু বললে, উহুঁ—এর মধ্যে কারসাজি আছে। আর কে করেছে তাও আমি বুঝেছি।

—কে আবার কারসাজি করবে?

—যে করেছে তার নাম তুমি জানো—কথাও শুনেছো। কে বল তো?

—দেবুদা!

—নিশ্চয়! দেবুদা ছাড়া একাজ অন্যের দ্বারা হতেই পারেনা।

—দেবুদাই যদি করে থাকে—তাহলে খু-বই অন্যায় করেছে। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে সাবিত্রী।

—মোটেই অন্যায় করেনি দেবুদা। বললে অদৃশ্য দেবু।

—কে—কে কথা বললে?

—আঃ—ভয় নেই। দেবুদা এসেছে।

—সাধে কি মাংসে নুন দিয়েছি। তোমাদের দু'জনকে নিয়ে সারা বাগানে ওরা কি বিশ্রী ঘোট পাকাচ্ছিল জানো।

—ঘোট পাকাচ্ছিল! কি ঘোট পাকাচ্ছিল, দেবুদা? শূন্যের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে ভানু।

—থাক্—সে সব বিশ্রী কথা তোমাদের শুনে কাজ নেই। দেখলে না—তোমাদের দু'জনকে ওরা খেতে পর্য্যন্ত ডাকলে না। তাইতো মাংসে নুন ঢালবার আগে তোমাদের দু'প্লেট দিয়ে গেলাম। অভদ্র—ছোটলোক সব।

—তা তোমায় এত রাগ কেন, বলতো ?

—হবেনা—তোমাদের বললে আমার রাগ হবে না—আমার গায়ে লাগবে না? বাঃ দাদাবাবু—বাঃ।

—আহা—হা চট্‌ছো কেন! ওকি চলে গেলে? দেবুদার সব ভালো—সব ভালো—মাঝে মাঝে শুধু চট্ করে চটে যায়। বললে ভানু সাবিত্রীর দিকে চেয়ে।

—কিন্তু যাই বল—দেবুদার মত ভালবাসতে কেউ তোমায় পারবে না।

ভানু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সাবিত্রীর দিকে চাইলে—অর্থাৎ তুমিও কি পারবে না।

সাবিত্রী কণ্ঠে কৃত্রিম ঝঙ্কার মিশিয়ে বললে, যান—সব কথায় শুধু ঠাট্টা। সোজা কথা ঘুরিয়ে এমন বাঁকা মানে করেন যে—

—আমি তো কথাটি কইনি—চোখে শুধু দেখেছি।

—দেখলে একবার কাণ্ডটা! অদৃশ্য দেবু ছুটতে ছুটতে এসে বলে।

চমকে উঠলো ভানু। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললে, কি হলো আবার?

—কি আবার হবে, তোমাদের দু'জনকে ইচ্ছে করে ফেলে সব হাওয়া হ'য়ে গেল হাওয়া-গাড়ীতে চেপে।

—মোটরে চলে গেল!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—, বুঝতে পারছো না—এ শুধু তোমাদের জব্দ করার মতলব। পালের গোদা হচ্ছে ঐ অরুণটা। ওই তো সবার কান-ভাঙানি দিয়ে নিয়ে গেল।

—তাহলে উপায়? আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে সাবিত্রী।

—উপায় যাহোক কিছু একটা করতেই হবে। ওরা ফেলে পালিয়ে গেল বলে—আমি তো আর তোমাদের ফেলে পালাতে পারিনা, বললে অদৃশ্য দেবু।

—তাই তো বলি—কেমন যেন সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।

—আমি ভেবেছি—ওরা সবাই ওধারে কোথাও জটলা কচ্ছে। উঃ পশুটাও ওদের দলে ভিড়ে গেল!

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে ভানু।

—সত্যি কথা বলতে কি—পশুপতির কোন দোষ নেই। সে তোমাদের ফেলে যেতে চায়নি বলে তাকে সবাই জোর জবরদস্তি করে গাড়ীর ভেতরে ভরে দিয়েছে। তা যা হবার তাতো হ'য়েই গেছে এখন গা তুলে আমার সঙ্গে হাঁটতে সুরু করো। সন্ধ্যে করে শুধু শুধু আর লাভ কি! বললে অদৃশ্য দেবু।

—আমার জন্যে তো আমি ভাবছি না—ভাবছি শুধু এঁ'র জন্যে। লোকে কথায় বলে—পথে নারী বিবর্জ্জিতা।

—তুমি ক্ষেপেছো দাদাবাবু! আমি সঙ্গে থাকতে! এসো আমার সঙ্গে।

ওরা দেবুর অনুসরণ করলে। বাগান পেরিয়ে ওরা পথে এসে নামলো। গত যুদ্ধের সময় পথটা তৈরী হ'য়েছিল, তৈরী হ'য়েছিল বেশ ভাল ভাবেই এখন স্বাধীন ভারতে বিনা সংস্কারে পিচ-চালা পথের বুকে ক্ষত চিহ্নের অন্ত নেই পায়ে চলা—বিশেষ করে মেয়েছেলের প.ক্ষ একরকম সাধ্যাতীত। জায়গায় জায়গায় পিচ আর পিচের তলার ইট পাথর সরে গিয়ে পথের পাশের জঙ্গল পথের মাঝে এগিয়ে এসেছে।

ভানুর সাহায্যে সাবিত্রী অতি কষ্টে এই বন্ধুর পথ ধরে এগিয়ে চলেছে অদৃশ্য দেবু চলেছে আগে আগে। দিনটা পূর্ণিমা ছিল বলে তাই রক্ষে নইলে মুস্কিলটা যে কতখানি হতো তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যকে ব'লে বুঝানো সত্যিই কষ্টকর। মেঘমুক্ত আকাশের বুকে চাঁদ হাসছে - চাঁদের হাসি ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।

পথটা ঘুরে আবার নদীর ধারেই গেছে। এবার প্রাকৃতিক দৃশ্যটি সত্যিই রমণীয় এবং লোভনীয়। এ হেন সময় যদি নদীর চরে প্রিয়ার সঙ্গে কাকেও প্রেমালাপে মত্ত দেখা যায়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এক জোড় ফিরিঙ্গী তরুণ ও তরুণীকে নদীর চরে নীচের দিকে নেমে বসে বসে গল্প করতে দেখা গেল। তরুণী তখন তরুণের কোলে মাথা রেখে চাঁদের দিকে চেয়ে আছে— তরুণ চেয়ে আছে প্রিয়ার মুখচন্দ্রের দিকে। প্রতিবিম্বিত চাঁদ হেলেদুলে নেচে চলেছে নদীর বুকে।

তাদের দ্বিচক্রযানখানি কাৎ হ'য়ে পড়ে আছে পথের ধারে। অদৃশ্য দে

এ সুযোগ হেলায় হারালে না। সে সাইকেলখানা তুলে নিয়ে তাতে চড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে বলে গেল—ঐ পথের বাঁকে জঙ্গলের ধারে সে ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

দেবুর কাণ্ড দেখে ওরা দুজনেই অবাক। একবার চলন্ত সাইকেল আর একবার ঐ হতভাগ্য প্রেমবিহ্বল ফিরিঙ্গী তরুণ-তরুণীর দিকে ওরা চেয়ে দেখে নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করলে।

—কাজটা কিন্তু দেবুদার ঠিক হলো না। বেচারাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে একবার ভেবে দ্যাখো দেখি।

—ভেবে দেখবার কিছু নেই। নিজেরাই ভুক্তভোগী হিসেবে অবস্থাটা বেশ ভাল ভাবেই উপলব্ধি কচ্ছি। ওকি—অমন কচ্ছো কেন মাতালের মত ?

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল সাবিত্রী, বললে ক্লান্ত কণ্ঠে, কি করি বলুন—পা যে টলে টলে পড়ছে !

—ঐ মেমসাহেবের অবস্থাটা ঠিক তোমারই মত দাঁড়াবে ভেবে তোমার দুঃখ হচ্ছে না ?

—রসিকতা রাখুন, আমি মরি আমার নিজের জ্বালায়—আর—

—তাহলে সাইকেলটা আপাততঃ নিয়ে দেবুদা খু-ব বেশী কি অন্যায় করেছে ? তোমার জ্বালা লাঘব করার জন্যই তো বেচারা—

সাবিত্রী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যথাসম্ভব জোরে হাঁটতে সুরু করলে। চলন দেখে বোঝা গেল—সে রেগেছে। ভানু ওর পিছনে চলতে সুরু করলে।

বাঁকের মুখ বরাবর যেতেই অদৃশ্য দেবু বললে, পায়ে কি চোট্ লাগলো, দিদি ! খোঁড়াচ্ছো কেন ?

অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে পিছু হটতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল সাবিত্রী। ভানু দু'হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেললে। রাগের বশে অদৃশ্য দেবুর অস্তিত্বের কথা সাবিত্রী ভুলেই গিয়েছিল, তাই হঠাৎ ভয় পেয়ে এই পিছু হটার চেষ্টা।

অদৃশ্য দেবুর নির্দ্দেশে সাবিত্রী বসলো সিটের সামনে আর ভানু দাঁড়াল

পিছনে, ওদের নিয়ে ঠিক যেন উড়ে চললো দেবু। দেখা গেল চালকবিহীন একটা সাইকেল দু'জন আরোহী নিয়ে পথ বেয়ে চলেছে। জন ও যান-বহুল রাস্তা ছেড়ে জন ও যান-বিরল রাস্তা ধরলে দেবু। প্রথম কারণ—তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে আর দ্বিতীয় কারণ—কারো চোখে পড়লে, ব্যাপারটা সে বুঝতে বুঝতে গাড়ীখানা তার দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে।

—উঃ যা জোরে চালাচ্ছো দেবুদা—একবার যদি পড়ি তাহলে আমার হাড় ক'খানিও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না!

অদৃশ্য দেবু বললে, কথা বললে আবার ভয় পাবে না তো দিদি! যা কাণ্ড ক'রে বসেছিলে—

— মূর্চ্ছা যাবার পূর্ব অবস্থা! পিছন থেকে বললে ভানু।

—হ্যাঁ—মূর্চ্ছা যাওয়া অমনি এতই সোজা!

—জানো দেবুদা! শাস্ত্রে বলে—পুরুষের বল বাহুতে আর মেয়েদের বল মুখে!

ওধার থেকে সাবিত্রী বললে, আমার সঙ্গে তোমার দাদাবাবুকে ঝগড়া করতে বারণ কর দেবুদা। আর জিজ্ঞেস ক'রে নাও—কোন শাস্ত্রে ঐ কথাগুলো লেখা আছে। শাস্ত্রকার কি উনি নিজে?

—তোমরা ঝগড়া সুরু করলে আমার কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে যাবার ভয় আছে, তা কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি। বললে দেবু।

—সত্যি—তুমি বড্ড জোরে যাচ্ছো, দেবুদা!

—আমার হাড় ক'খানা থাকতে তোমাদের হাড় আস্তই থাকবে জেনো। ন'টা বাজবার আগে তোমায় হোষ্টেলে পৌছাতে হবে—সে খেয়াল আছে! ধীরাজবাবুর কাছে তোমায় অপমান করার জন্যেই তো অরুণের দলের এই চক্রান্ত! তার আগে সাবিত্রীকে তার বাড়ীতে পৌছে দিতে হবে। বললে অদৃশ্য দেবু।

ক্ষণেক নীরবতার পর অদৃশ্য দেবু বললে, যাদের এই সাইকেল চুরি করে এনেছি—তাদের অবস্থাটা একবার কল্পনা কর দেখি! তোমাদের পৌছে দিয়ে আমাকে আবার ফিরে এসে তাড়াতাড়ি ওদের সাইকেল ফেরৎ দিতে হবে।

—আমার দিকে ফিরে কথাগুলো না বলে—সামনের দিকে ফিরে বল। রহস্যঘন কণ্ঠে বললে ভানু।

—তুমি তো এতটা ঝগড়াটে ছিলেনা দাদাবাবু!

—সঙ্গদোষে হ'য়েছি।

—আমি কিন্তু জবাব দিতে পারি, দেবুদা! সামনের দিকে চেয়েই বললে সাবিত্রী।

—দোহাই দিদি—জবাব আর দিও না। মোটর হলেও নয় কথা ছিল—, সাইকেলে চড়ে কেউ কি ঝগড়া করে!

অদৃশ্য দেবুর কথা বলার ধরণে ভানু আর সাবিত্রী দু'জনেই হেসে ফেললে। সাইকেল ছুটে চললো।

সাবিত্রীকে তার বাড়ীর সামনে নামিয়ে দিয়ে ওরা হোষ্টেলের সামনে এসে নামলো। সঙ্গে সঙ্গে গেটও ওদের চোখের ওপর বন্ধ হ'য়ে গেল। হোষ্টেলের জরুরী নিয়ম—ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

অদৃশ্য দেবু ভানুর কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি কি যেন ব'লে চলে গেল। ভানু সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ফুটপাথের ওপর। হঠাৎ তার চোখের সামনে দরজা খুলে গেল। অদৃশ্য দেবুর হাতে সাইকেলটা দিয়ে ভানু চোরের মত চুপিসাড়ে হোষ্টেলে গিয়ে ঢুকলো।

ওদিকে তখন অরুণের দল গিয়ে সুপারিনটেনডেন্ট ধীরাজবাবুর কাছে হাজির। ওদের নালিশ শুনে ধীরাজবাবু বললেন, ভানু এখনো ফেরেনি!

—শুধু আজ ব'লে নয়, স্যার—প্রায়ই ও রাত করে ফেরে।

—কিন্তু হোষ্টেলে ঢোকে কেমন করে? ওকে গেট খুলে দেয় কে?

অরুণ মাথা চুলকে বললে, তা তো জানি না, স্যার।

—কি হে—তোমরা কেউ কিছু জানো?

অজিত কড়িকাঠের ওপর চোখ তুলে বললে, ফার্ষ্ট বয়েদের কাণ্ডই স্যার—আলাদা! পাইপ টাইপ বেয়ে ওঠে হয়তো।

—পাইপ বেয়ে ওঠে! কি বলছো তোমরা!

জহর মরিয়া হ'য়ে বললে, তবে এইটুকু বলতে পারি Sir আমি জোর গলায়, মাঝে মাঝে দারোয়ান ওর কাছ থেকে মোটা রকম বখশিশ পেয়ে থাকে।

—তোমরা আমাকে জানাওনি কেন?

—কি ক'রে জানাবো বলুন! হাতে-নাতে প্রমাণ তো স্যার—কিন্তু নেই!

—আই সি! আচ্ছা—এসো তো সব আমার সঙ্গে! ধীরাজবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

—সত্যি মিথ্যে আজই—স্যার—প্রমাণ হ'য়ে যাবে! ব'লে সদলে অরুণ ধীরাজবাবুকে নিয়ে বীরবিক্রমে চললো ভানুর ঘরের দিকে।

ভানু হাঁফাতে হাঁফাতে এসেই তার বিছানায় শুয়ে পড়েছে। উঃ এতখানি পথ সাইকেলের পিছনে দাঁড়িয়ে আসা কি যে-সে কথা! যাক্—বড্ড জোর বাঁচা গেছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—এক গ্লাস জল হাতের কাছে পেলে হ'তো। বিছানা ছেড়ে উঠে কুঁজো থেকে গড়িয়ে জল খেতে শরীর আর বইছে না। পশুটা দেখছি—পড়তে পড়তে উঠে গেছে।

ভানু তেষ্টা দমন করে অত্যধিক ক্লান্তি হেতু চোখ বুজিয়ে স্থির, নিশ্চল হ'য়ে পড়ে রইলো। পশু ফিরে এলে—ওরই কাছ থেকে এক গ্লাস জল চেয়ে খেলেই হবে। তন্দ্রার ঈষৎ ক্লান্ত আবেগ নেমে এলো ভানুর চোখে। পিক্-নিক্ সংক্রান্ত সারাদিনের ঘটনা টুকরো টুকরো ছবি হ'য়ে—একটার পর একটা ভেসে উঠতে লাগলো তার মনশ্চক্ষুর সামনে। ভারি ভাল লাগে এই ছায়া-ছবি—ভারি ভাল লাগে এই তন্দ্রার আবেশ।

—হু-হু ইজ দেয়ার! কে শুয়ে?

—ধীরাজবাবুর গুরু গম্ভীর আওয়াজে ভানুর টুটে গেল মধুভরা তন্দ্রার আবেশ। চোখ মেলে দেখলে—দরজায় তার অপূর্ব জনসমাবেশ। ভানু সুখ-শয্যা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। একি কল্পনাতীত অতর্কিত আক্রমণ!

—এমন অসময়ে শুয়ে কেন?

—পিক্-নিক্ থেকে ফিরে—শরীরটা স্যার কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ কচ্ছে।

অরুণের দলের দিকে তীব্র, তীক্ষ্ণ, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ধীরাজবাবু চেয়ে দেখলেন।

—উইথ ফুল ব্যাটেলিয়ন—ব্যাপার কি, স্যার? কিছু না বোঝার ভাণে ছলনার আশ্রয় নিলে ভানু।

অরুণদের দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন ধীরাজবাবু, ইউ আর এ গ্রুপ অব ইডিয়টস্‌!

পা টিপে টিপে পশুপতি এসে দরজার ধারে দাঁড়াল। মুখে তার দুষ্টামির হাসি।

ভানু কৃত্রিম বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললে, আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, স্যার!

—তুমি হো—হো—হো—হোস্টেলে ফিরেছো কিনা তাই স্যার দে—দে—দেখতে এসেছেন—মানে বি—বি—বিপক্ষ দল ধরিয়ে দেবার জন্যে নি—নি—নিয়ে এসেছে। ব'লে অরুণদের দিকে চেয়ে ক্যাবলার মত হাসতে লাগলো—, ভাবটা—কেমন ঠকান সব ঠকলে! আর কখন অন্যের পিছনে লাগবে!

ধীরাজবাবু ঈষৎ লাজ-নম্র কণ্ঠে বললেন, আই এম সরি—মাই বয়!

তখন অরুণের দলের অবস্থা -'মা বসুমতী! তুমি দু'ফাঁক হও! আমরা সমবেত ভাবে তোমার গর্ভে আত্মগোপন করে এই নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাই।

ধীরাজবাবু তাদের দিকে রোষকষায়িত নেত্রে একবার চেয়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

পশু সোল্লাসে বললে, ডিয়ার ই-ই—ই—ইনফরমার্স! ডো—ডো—ডোণ্ট বি ডিসহার্টেণ্ড! বসুন—, যা হবার তা তো হ'য়েইছে। আসুন এক এক পে—পে—পেয়ালা সব চা খাওয়া যাক্‌। অবাক হবার কি—কি—কিছু নেই। লোকে ক—ক—কথায় বলে, 'রা—রা—রা—রাখে হরি মারে কে আর মা—মা—মারে হরি রা—রা—রাখে কে!"

—ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে! এক মাঘে শীত পালায় না! আসছে পৌষ মাসে আমরাও দেখে নেবো! আমাদের তামাসা করা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবো—মনে থাকে যেন! চল্‌—চল্‌—, কি সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

অজবুকটার কথা শুনছিস্! ব'লে প্রায় এক রকম ঠেলতে ঠেলতে সবাইকে বাইরে নিয়ে এলো অরুণ!

—দে—দে—দেখলে তো ভানুদা! ওরা আমাকে অ—অ—অ—অজবুক ব'লে গালাগাল দিয়ে গেল!

—দেখলাম না—শুনলাম! বললে ভানু।

—এ সময় তু—তু—তুমিও আমাকে ঠা—ঠা—ঠাট্টা কচ্ছো! এটাই কি কলির ধ—ধ—ধর্ম্ম! তোমাকে সা—সা—সাপোর্ট করতে গিয়েই তো— —

সমীর গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকে পশুর দাড়ি ধরে গাইতে সুরু করলে,

"সই কেমনে ধরিব হিয়া—
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।"

ভানু বললে, তোমার আঙ্গিনা দিয়ে তোমারি বঁধু অন্যের বাড়ী চলে গেল—তার জন্যে তার শাস্তির কি ব্যবস্থা করলে?

পশুর মুখটা তুলে ধরে সমীর গাইলে,

"আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে!"

—আমি ভাবলাম, সে রকম বিশ্বঘাতী বঁধুয়াকে তুমি চিরদিনের মত ত্যাগ করবে।

—ছিঃ তা কি পারি বন্ধু! যার বুকে একবার বুক মিশিয়েছি—যার মুখে একবার মুখ মিশিয়েছি তাকে কি অত সহজে ত্যাগ করবো বললেই ত্যাগ করা যায়! কিরে পশো! তোমার গোমরা মুখে কি হাসি ফুটবে না?

—ভা—ভা—ভানুদা আমাকে—

—সব শুনেছিরে দাদা—দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। তুই ব্যাটা—ঠাট্টা ইয়ারকিও বুঝছিস না! নাঃ তুই একটা—তুই একটা—তুই একটা কিস্সুই না। ব'লে নিজের রসিকতায় সমীর নিজেই হাসতে সুরু করলে।

হঠাৎ এ উল্লাসের মানে কি সমীরদা ? গায়ের জামা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলে ভানু।

—সিনেমা! ব'লে সমীর গম্ভীরভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিকটস্থ চেয়ারখানায় পায়ের ওপর পা তুলে গদিয়ান হয়ে বসে সিগারেট টানতে লাগলো।

—সিনেমা দেখতে গেসলে ? জিজ্ঞেস করলে ভানু।

—সিনেমা দেখা! আমি দেখবো সিনেমা! অল্ বম্ -- রট্ন! এবার থেকে লোকে আমায় দেখতে আসবে সিনেমায়! ব'লে শূন্যে চেয়ে সমীর সিগারেটের ধোঁয়ায় রিঙ তৈরী করার চেষ্টা করলে।

ভানু দেশলাইয়ের ওপর সিগারেটটা ঠুকতে ঠুকতে এসে সমীরের সামনে দাঁড়াল। চোখে তার বিস্ময়ের ছায়া। সমীর বন্ধুর দিকে অপাঙ্গে একবার চেয়ে আবার নিজের সিগারেটে মন দিলে, ভাবটা—ব্যাপারটা শুনলে রক্-বাজির ভাষায় এখুনি ট্যারা হ'য়ে যাবে।

—তোমার কথা তো কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, সমীরদা! ব্যাপার কি ? আগ্রহান্বিত কণ্ঠে বললে ভানু।

—নাউ আই এম্ এ্যান আর্টিষ্ট অর্থাৎ আমি একজন হবু-অভিনেতা। আজই 'ফোর টোয়েনটি' পিক্চার্সের সঙ্গে কনট্রাক্ট ক'রে এলাম। ব'লে আনন্দের আতিশয্যে জ্বলন্ত সিগারেটের ছোট্ট টুকরোটা দিয়ে আস্তো একটা সিগারেট সমীর ধরিয়ে নিলে।

—পিক্-নিক্ থেকেই বা ফিরলে কখন আর কনট্রাক্টই বা করলে কখন ?

—কথাবার্ত্তা অনেক দিন থেকেই চলছিল। আজ হোষ্টেলে ফিরেই কোম্পানীর চিঠি পেলাম। আজই সন্ধ্যায় দেখা করতে বলেছে। ধীরাজবাবুর কাছে ঘণ্টাখানেকের ছুটি নিয়ে ওদের অফিসে গেলাম। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কনট্রাক্ট! অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছো ? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? ব'লে সমীর তার বুক পকেট থেকে কনট্রাক্টের স্বাক্ষরিত ফর্ম-খানা ভানুর চোখের সামনে খুলে ধরলে।

—বাঃ বাজি মাৎ! কনগ্রাচুলেশন্—!

—বাজি মাৎ কিন্তু সহজে হয়নি বন্ধু! এর জন্যে আমায় অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে।

—সেটা কি রকম? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে ভানু ওর পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলো।

পশুপতির মনমরা ভাবটা প্রায় কেটে এসেছে। বিস্ময়ভরা চোখে সে ওদের সামনে টেবিলের ওপর মুখোমুখি হ'য়ে বসলো।

—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রথমতঃ আমার মুখের নানা ভঙ্গিমায় ছবি নেওয়া হবে বলে নগদ-নারায়ণ দিতে হলো দক্ষিণা হিসাবে দশটি টাকা। তারপর দু'নম্বর—পরীক্ষা দিতে হলো গলার স্বরের নানান কারসাজির। পরীক্ষা ফি বাবদ দিতে হলো করকরে পঁচিশটি টাকা। অথচ—আশ্চর্য্য! আমার না তোলা হলো নানা-ভঙ্গিমার ছবি আর না নেওয়া হলো গলার স্বরের পরীক্ষা। আপসে পুরোপুরি ফুল-মার্ক পেয়ে পাস করে গেলাম বিনা পরীক্ষায়।

—সাধ করে কি আর কোম্পানীর নাম রেখেছে ফোর-টোয়েন্টি! ছবিখানার নাম দিয়েছে—নিশ্চয় জালিয়াতি?

—না—ধাপ্পাবাজি। ভারি রোমান্টিক—থ্রিলিঙ্ গল্প।

—শেষ রক্ষা হলেই বাঁচি। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। এ সব ছবিতে কাজ পেয়ে কাজ করা মানেই চাঁড়ালের বাড়ী নিমন্ত্রণ পেয়ে ফলার সমাধা করা। কি বলিস, পশু?

—আমি না—না—নামবো ছবিতে! আ—আ—আর্টিষ্ট হবার আমার বড্ড সাধ, সমীরদা! আমাকে মাইরি ঢু—ঢু—ঢু—ঢুকিয়ে দাওনা ঐ ছ—ছ—ছবিতে।

—থাম্—থাম্, তুই ব্যাটা কি চেহারায় ছবিতে নামবি? বলে—কত হাতী ঘোড়া গেল তল আর মশা বলে কত জল! যা ব্যাটা—ঐ দেয়ালের গায়ে আয়না ঝুলছে, উঠে গিয়ে নিজের চাঁদমুখখানা একবার দেখে আয়, তারপরও যদি ছবিতে নামবার সাধ যায় তো আমাকে এসে বল।

—কেন—চা—চা—চাকর-বাকরের পার্ট বুঝি ছ—ছ—ছবিতে থাকে না! তাছাড়া আমার এই ক—ক—ক—কমিক চেহারা দেখেইতো লোকে হে—হে—

হেসে লুটে পড়বে। তো—তো—তো তোতলামির পাঠ দিলে তো—ক—ক—কথাই নেই, হাসিয়ে সব পেটে খি—খি—খিল ধরিয়ে দেবো!

—আচ্ছা, কলেজে প্রক্সির ব্যবস্থা করে কাল যাস আমার সঙ্গে। স্যুটিং দেখতে হবে আর ডিরেকটারের চোখে যদি লাগে তাহলে একটা পার্টও পেয়ে যাবি। তবে সাবধান—আপাততঃ কারো কানে কথাটা যেন না ওঠে, তাহলে চেনো তো ধীরাজবাবুকে—একবারে দেশছাড়া করে ছেড়ে দেবে। ভদ্রলোক বায়স্কোপের নামে হাড়েচটা। বায়স্কোপ দেখলে রামটিকেট করে ছাড়ে, বায়স্কোপে নামলে তো আর কথাই নেই—টিকেট কাটিয়ে কলকাতা ছাড়িয়ে ছেড়ে দেবে। বায়স্কোপ-ফোবিয়া ওঁর একটা ব্যাধি!

-এ যুগে ও ধরণের লোক তো বড় একটা দেখা যায় না! মন্তব্য করলে ভানু।

—ঠি—ঠি ঠিক বলেছো। যাকে বলে শুষ্কং কা—কা—কাষ্ঠং—বেরসিক।

মুচকি হেসে বিজ্ঞজনোচিত গাম্ভীর্য্যে বললে সমীর, কোথায় যে ওঁর ব্যথা আর কেন যে ওঁর ঐ বায়স্কোপ-ফোবিয়া তাও এ শর্মার জানতে বাকি নেই। অনেক দিনের গভীর গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে।

—সে—সে—সে—সেটা কি রকম? জানবার আগ্রহ যেন পশুপতির চোপ-মুখ দিয়ে ফেটে পড়ে।

-হ্যাঁ—আমি তোমার কাছে বলি আর তুমি ঢাক পিটিয়ে সব বেফাঁস করে দাও! আমি তখন গলায় ফাঁসি দিয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝুলি!

—বলনা মা—মা—মাইরি!

—আবে সে বান্দা আমি নই।

সমীরের সামনে ঝুঁকে বসে পশুপতি বললে, মা—মা—মাইরি দিব্যি গালছি।

—তোর মাইরি দিব্যির কোন দাম আছে! ভাত, মুড়ি, চা খাওয়ার মত ওটা তোর একটা কথার কথা দাঁড়িয়ে গেছে।

—আচ্ছা, তবে কা—কা—কালীঘাটের মা কালীর দি—দি—দিব্যি কচ্ছি।

—এর ওপর আর কথা নেই। কালীঘাটের মা কালী অর্থাৎ কাঁচাখেকো দেবতা! ব'লেই ফ্যালো সমীরদা! পশুপতিকে সমর্থন ক'রে বললে ভানু।

সমীর আর একটা সিগারেট ধরালে। পশুপতি তড়াঙ্ করে লাফিয়ে পড়লো টেবিল থেকে। দরজার দিকে যেতে যেতে বললে, দাঁড়াও—কাপ তি—তি—তি—তিনেক চায়ের অ—অ—অ—অর্ডার দিয়ে আসি!

চায়ের অর্ডার দিয়ে ফিরে এলো পশুপতি। বললে, এইবার সু—সু—সু—সুরু কর। চা নইলে কি গ—গ—গল্প জমে!

—গল্প হলেও সত্যি! শোন তবে! আচ্ছা, তন্দ্রা দেবীর তোরা নাম শুনেছিস?

—কোন্ তন্দ্রা দেবী—সিনেমা এ্যাকট্রেস? জিজ্ঞেস করলে ভানু।

—হ্যাঁরে বাবু—হ্যাঁ!

—কি আশ্চর্য্য—, তন্দ্রাদেবীর নাম শোনা ছেড়ে—হাজার একটা ছবিতে তার অভিনয় দেখেছি। বর্ত্তমানে তন্দ্রাদেবীর নামে দর্শক-সাধারণ পাগল—বিশেষ করে কলেজের ছেলেরা!

—রোজ রাত্রে আমার চোখে ত—ত—ত—তন্দ্রা নামবার আগেই তন্দ্রাদেবীর ছবিখানি চোখের ওপর ভে—ভে—ভেসে ওঠে। উঃ কি লা—লা—লা—লাগ্‌সই দেখতে মাইরি। যাকে বলে খা—খা—খাপসুরত। এক কথায়—

বাধা দিয়ে সমীর বললে, সো ফার—নো ফারদার! সম্বন্ধে আমাদের উনি গুরুজন—বাস্—আর কোন অবান্তর বেফাঁস কথা যেন মুখ দিয়ে না বেরোয়!

ভানু অবাক হয়ে সমীরের দিকে চাইলে। পশু বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললে, গু—গু—গু—গুরুজন!

—আলবৎ গুরুজন অর্থাৎ গুরুপত্নী! গুরুপত্নী কি আমাদের ঠাট্টার পাত্রী! কাজেই—মুখ সামলে! এখনো তোমাদের মাথায় ঢুকলো না!

ওরে—উনিই হচ্ছেন আমাদের হোষ্টেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ধীরাজবাবুর প্রথম পক্ষের বিবাহিতা স্ত্রী।

—বি—বি—বিবাহিতা স্ত্রী! পশুপতির চোখ দুটো কপালে উঠে গেল।

—তাহলে এখন যাঁকে নিয়ে ঘরকন্না কচ্ছেন—উনি?

—উনি হচ্ছেন দ্বিতীয় পক্ষ!

ভানু দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, সম্পর্কে গুরুজন—কি আর বলবো! ঠিক যেন জ্যান্ত রক্ষেকালীর বাচ্চা! স্যারের রুচিকে বাহবা দিতে হয়, কোথায়, তন্দ্রাদেবী আর কোথায় শ্যাওড়া গাছের পেত্নী!

—সাধে কি আর ভদ্রলোক পেত্নীকে পত্নী করেছে রে ভাই—নইলে যদি আগেরটার মত এটাও বেহাত হ'য়ে যায়। সুন্দরী স্ত্রীলোক আর সিনেমা শো—ভদ্রলোক দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

—তুমি যখন এত কথা জানো তখন নিশ্চয়ই গোড়ার কথা তোমার অজানা নয়। আচ্ছা, তন্দ্রাদেবী কেমন করে সিনেমায় এলেন?

—মূলে তো ঐ সিনেমা। সিনেমা দেখে দেখে ভদ্রমহিলার মাথা খারাপ হ'য়ে গেল। বললেন—আমি সিনেমায় নামবো। অমনি দাদার দল বললেন, অপূর্ব! তুমি সিনেমায় নামলে চিত্র-জগতে একটা নতুন যুগ আসবে। স্বামী দেবতা বাধা দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সে বাধা টিক-সই হলো না, দাদার দলই জয়ী হলেন। অবলা দেবী (ওঁর আগের নাম) সবলা হ'য়ে তন্দ্রাদেবী নাম নিলেন সিনেমায় নেমে। তারপর স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে তালাক দিয়ে দিলেন।

—অতঃপর তন্দ্রাদেবী কি করলেন?

—বড় হবার আশায় চিত্র-জগতের রথ-রথীর শরণাপন্ন হলেন! হাত ফেরতা হ'তে হ'তে যশের উচ্চশিখরে গিয়ে উঠলেন। বর্ত্তমানে তিনি একজন নামকরা প্রযোজক-পরিচালকের ধর্মপত্নী! বিয়ে হয়েছে শালগ্রাম সাক্ষী করে নয়—দলিল স্বাক্ষরিত করে। সোজা ভাষায় যাকে বলে—রেজিষ্টার্ড-ম্যারেজ।

—এতদিনে পরিষ্কার বোঝা গেল—কেন ভদ্রলোকের সিনেমা-ফোবিয়া ব্যাধি !

—ত—ত—তন্দ্রাদেবী তাহলে আমাদের ধী—ধী—ধী ধীরাজবাবুর ইয়ে ?

—এককালে ছিলেন ইয়ে, আজ হয়ে গেছেন ইতি !

সমীরের কথায় ভানু আর পশুপতি উভয়েই হেসে উঠলো।

ষ্টুডিয়ো—ফিল্ম ষ্টুডিয়ো। সাধারণ লোকের কাছে এর মধ্যে ঢুকতে পাওয়া মানে স্বর্গের নন্দনকাননে প্রবেশাধিকার পাওয়া। না জানি ঐ প্রাচীর-ঘেরা বাগানের মধ্যে কি নাই আর কি আছে। বাইরে থেকে দেখা যায় ওর ভিতরের ঐ সাত-তলা উঁচু ছাদবিহীন করোগেট বা এ্যাসবেষ্টস-ছাওয়া ঘরের মাথা।

না জানি কত মধুই না জমা হ'য়ে আছে ঐ কল্পনার স্বর্গরাজ্যে। মরাল-মরালীর মত হিরো-হিরোইনরা কতই না আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে ঐ প্রাচীর-ঘেরা নন্দন-কাননে। ভাগ্যবান, ভাগ্যবতী ছাড়া কার সাধ্য ওর মধ্যে প্রবেশাধিকার পায়।

পয়সা ফেললে ছবি দেখা যায় কিন্তু ছবি যে কি করে তৈরী হয় তা দেখাবার জন্যে টিকিটের কোনই ব্যবস্থা নেই। রান্না কালিয়া খেতে ভালো কিন্তু কালিয়া যে কি করে রান্না হয় তা দেখতে ভাল লাগা কি এতই অস্বাভাবিক !

এ হেন মায়াপুরীর মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়ে আজ ভানু, সাবিত্রী আর পশুপতি এসেছে তাদের সমীরদার সুটিং দেখতে। ওদের সঙ্গে আর একজন এসেছেন—তিনি অবশ্য আছেন অলক্ষ্যে ! ফ্লোরের মধ্যে দর্শকদের ভীড় খুবই কম। এটাই নাকি এখানকার নীতি এবং রীতি। দর্শকের সংখ্যা যত বাড়বে—কাজের পরিমাণ ততই কমবে।

দূরে পাহাড় ; পাহাড়ের ওপর থেকে ঝরণা নেমে এসেছে। ঐ ঝরণার জল পাহাড়ের কোলে ছোট নদীর আকার ধারণ করে চলে গেছে দূর হ'তে

দূরান্তরে। অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমির ওপর একটি সুসজ্জিত ফল ও ফুলের বাগান। বাগানের গা দিয়ে বয়ে চলেছে ঐ ঝরণা-ঝরা ক্ষুদ্র তটিনী। নদীর ধারে একটি কামিনী ফুলের গাছ। গাছের তলায় বসে নায়ক সমীর বাঁশী বাজাচ্ছে আর নায়িকা তন্দ্রাদেবী লীলায়িত ছন্দে নৃত্য কচ্ছেন। এমন সময় একজন দৈত্য এসে নায়িকাকে শূন্যে তুলে নিয়ে চলে গেল।...... এই হলো সট্। বারম্বার রিহার্সাল দিয়ে পরিচালক সট্‌টি টেক্ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইলেকট্রিসিয়ান রেডি হলেন তাঁর আলো নিয়ে। ক্যামেরা-ম্যান ট্রলির ওপর উঠে বসলেন।

পরিচালক ক্যামেরার ধারে এসে দাঁড়ালেন। আর্টিষ্টরা যে যার জায়গায় রেসের ঘোড়ার মত সন্ত্রস্ত—। ভাবটা—পরিচালকের নির্দ্দেশ পেলেই হয়।

—আমি এসে গেছি! ভানুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে তার কানের কাছে ফিস-ফিস করে বললে অদৃশ্য দেবু।

—এতক্ষণ ছিলে কোথা? চেয়ারের পিছন দিকে ঘাড় বেকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললে ভানু।

—আশ-পাশ সব ঘুরে বেড়িয়ে দেখে শুনে এলুম।

—এইবার ছবি তোলা হবে। চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকো!

ভানুর কথা তখনও শেষ হয়নি, পরিচালক সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, আর উই রেডি ?

ক্রিং ক্রিং করে দু'বার বাজার বেজে উঠলো।

—এবার টেক্ করবো। ঠিক আছে তন্দ্রাদেবী? বললেন পরিচালক।

মিহিগলায় তন্দ্রাদেবী বললেন, ও কে। অর্থাৎ ঠিক আছে।

—ক্যামেরা রেডি?

—ইয়েস, স্যার।

—সাউণ্ড?

ক্রিং ক্রি করে দু'বার বাজার বেজে উঠলো।

—কোয়াইট! কোয়াইট ইন দি ফ্লোর! স্টার্ট!

ক্রিং ক'রে একটা বাজার বেজে উঠলো। ইতিমধ্যে গোটা সেট বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। বাজারের শব্দ পাওয়া মাত্র সহকারী পরিচালক ক্লাপার মারলেন—খটাঙ্‌।

পরিচালকের ইসারায় তন্দ্রাদেবী সুরু করলেন নৃত্য, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে ফুঁ দিলে সমীর!

নৃত্য চলেছে—হঠাৎ হলো দৈত্যের আবির্ভাব। জালের মত করে দৈত্য একখানা কালো চাদর নায়িকার ওপর চাপা দিয়ে দিলে পিছন থেকে। নায়িকার চীৎকার করবার আগেই দৈত্য তাকে শূন্যে তুলে নিলে। এইবার নায়কের পালা তাকে উদ্ধার করবার। কিন্তু নায়ক বাঁশী থামিয়ে ওঠবার আগেই দৈত্য 'ওরে—বাপ—রে' বলে পড়ে গেল নায়িকাকে ছেড়ে।

পরিচালক চীৎকার ক'রে উঠলেন, কাট্! কাট্!

সহকারী পরিচালক ব'লে উঠলেন, এঃ সব মাটি হ'য়ে গেল! সটটা বেশ সুন্দর যাচ্ছিল!

পরিচালক এগিয়ে দৈত্যরূপী অভিনেতার কাছে এসে বললেন ঈষৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে, কি হলো—আপনি হঠাৎ পড়ে গেলেন কেন? আপনার তো পড়ে যাবার কথা নয়। নায়কের সঙ্গে আপনার দস্তুর মত ফাইট হবে, তবে তো পড়বেন। নায়ক বাঁশী ছেড়ে ওঠবার আগেই—ভয়ে আপনি ধড়াস করে পড়ে গেলেন! মনিটারের সময় তো ঠিক করলেন!

—আপনি ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন না, স্যার—মানে আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পাচ্ছি না। তন্দ্রাদেবীকে ধরে শূন্যে তোলামাত্র কে আমাকে ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিলে!

—কৈ—ঘুষি তো আপনাকে কেউ মারেনি! আপনাকে কেউ গিয়ে ঘুষি মারলে আর আমরা দেখতে পেলাম না! আপনি কি মশাই—জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন! নিন—ঠিক করে আর একটা মনিটার দিন, তারপর টেক্ করবো! তন্দ্রাদেবী কোথা গেলেন? হন্ত-দন্ত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক।

—তাঁর মেক-আপ্ নষ্ট হ'য়ে গেছে; তাই মেক-আপ রুমে গেছেন মেক-আপ্ করতে—বললেন সহযোগী পরিচালক।

—ব্যাড্ ষ্টার! নাঃ আজকের দিনটাই মাটি! ব'লে পরিচালক হতাশভাবে এসে ছোট্ট বেতের মোড়াটার ওপর বসে একটা বর্মা চুরুট ধরালেন।

ইশারায় সাবিত্রীকে ডেকে নিয়ে ভানু ফ্লোর থেকে বেরিয়ে এলো।

ওদের গমনপথের দিকে চেয়ে পশুপতি বলে উঠলো, আমি থাকবো—না যাবো?

ভানুর দিক থেকে কোন জবাব এলো না, অগত্যা পশুপতিকেও অনিচ্ছাসত্বেও বেরিয়ে আসতে হলো।

—কি ব্যাপার বলুন তো! কোথাও কিছু নেই—

সাবিত্রীকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে পশুপতি পিছন থেকে বলে উঠলো, লোকটা ডি—ডি—ডিগবাজী খেয়ে গোঁ—গোঁ—গোঁঙাতে সুরু করলে। ব্যাটা নে—নে—নেশা-টেশা করেছে বোধ হয়।

—বাজে বকিস্‌নি। চুপ কর। ধমক দিলে ভানু।

—চু···চু—চুপ করবো! কি বলছো তু—তু—তু—তুমি! অত বড় একটা সা—সা—সাঙ্ঘাতিক আশ্চর্য্য ব্যাপার—আর আমি বো—বো—বো-বোকার মত চুপ করে থাকবো!

—ভাখ পশু, শুধু শুধু ইডিয়টের মত চ্যাচাসনি।

—ই—ই—ইডিয়ট—ফিডিয়ট ক'রে যা মুখে আসচে তাই ব'লে তুমি বিফোর এ লে—লে—লেডি—আমাকে ই-ই—ই—ইনসাণ্ট করবে! চাই না আমি তো—তো—তোমাদের সুটিং দেখতে। না হয় সি—সি—সিনেমায় আমার নাই নামা হলো! আমি চ—চ-চললাম। পশুপতি রেগে চলে গেল।

—দেখুন দেখি কাণ্ড! একেই বলে—চায়ের কাপে তুফান তোলা! বললে সাবিত্রী।

—খুব স্যুটিঙ্ দেখা হ'য়েছে, এবার ফেরা যাক। নাঃ দেবুদাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

—কেন—দেবুদা আবার কি করলে ?

—এ কেলেঙ্কারী কাণ্ড নিশ্চয় দেবুদার কীর্ত্তি।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে ভানু।

পাশ থেকে অদৃশ্য দেবুর কণ্ঠ শোনা গেল, ঠিক ধরেছো তো!

—ভারি বাহাদুরী করেছো! তোমার কি একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? নাঃ তোমাকে নিয়ে ভদ্রসমাজ কেন—কোন সমাজেই যাওয়া যায় না। এত করে বলেছি—

—আহা—হা! চটছো কেন! আগে ব্যাপারটা শোন। স্যুটিং দেখতে দেখতে তন্ময় হ'য়ে আমি নিজেকে ভুলে গেলুম। হঠাৎ আমার মনে হলো—ঐ অসভ্য দৈত্যটা সুন্দরী মেয়েটাকে নিয়ে সত্যি সত্যি পালাচ্ছে। তাই আর থাকতে না পেরে—ছুটে গিয়ে মারলুম ব্যাটাকে টেনে এক রদ্দা! তারপর বুঝলুম, কাজটা আমার শুধু ভুল নয়—দস্তুর মত অন্যায় হ'য়ে গেছে। আর আমার ওপর চটলে কি হবে বল দাদাবাবু, ছোঁড়া ঢিল এখন হাতের বাইরে! এসো—ফেরা যাক!

আজকাল প্রায়ই কলেজ থেকে ফিরে ভানু তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে জল-খাবার খেয়ে বেশ ব্যস্তভাবেই বেরিয়ে পড়ে। কিছুদিন যাবৎ অরুণের দল এটা লক্ষ্য করে আসছে। অনুমানে ধরেছে—ভানু যায় সাবিত্রীদের বাড়ী। সেখান থেকে সাবিত্রী নিয়ে যায় সিনেমায় আর নয় কোন পার্কে। গঙ্গার ধারেও যেতে পারে! আজ সাব্যস্ত হলো—সবাই তাকে অনুসরণ করবে। তাছাড়া আরো একটা উদ্দেশ্য আছে—সেটা অবশ্য জহরের একান্ত নিজস্ব। বহুদিন থেকে যমুনার ওপর তার একটা দুর্বলতা আছে, বর্ত্তমানে সেই দুর্বলতা তাকে অতিরিক্ত মাত্রায় দুর্বল করে ফেলছে। যমুনাকে কিন্তু আজও সে ঠিক বুঝে

উঠতে পারেনি। আজ তাই পরখ করে দেখবে—কি তার মনের গূঢ় উদ্দেশ্য। অবশ্য অনুপও যে যমুনার ওপর ফল্-ইন্—এই গূঢ় তথ্যটা ওদের দলের কাছে একেবারে অপ্রকাশ্য। আচ্ছা চাপা ছেলে ঐ অনুপ!

অরুণের দল ভানুর আগেই বেরোবার জন্য প্রস্তুত। ভানুকে সেজে-গুজে বেরোতে দেখে জহর অর্থপূর্ণ কণ্ঠে ডাকলে, অরুণ!

—দেখেছি।

—ওঃ ব্যাটা যেন একবারে জামাই সেজে বেরিয়েছে।

—যেখানেই যাক্—আজ বামাল সমেত হাতে নাতে ধরা চাই।

—অজিত তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে ভানুর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বললে, এই যে ভানুবাবু!

—হ্যাঁ—আমিই বটে!

—বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি? পিছন থেকে জহর হেসে জিজ্ঞেস করলে।

—না—স্নান করতে!

—সাবিত্রী সঙ্গমে—না যমুনায়?

—ফিরে এসে বলবো। ভানু পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

—ভানু গিয়ে পৌছাবার আগেই আমরা গিয়ে সাবিত্রীদের বাড়ীর পাশের গলিটায় লুকিয়ে থাকবো। চল্—একটা বেবী-ট্যাক্সি ডাকা যাক। কোন চিন্তা নেই, ভাড়া আমি দেবো—বললে জহর।

সাবিত্রীদের বাড়ীর অল্প দূরে ওরা ট্যাক্সী থেকে নেমে গলির ভিতর গিয়ে ঢুকলো।

অরুণ বললে, তুই একা গিয়ে তোর কাজটা এই ফাঁকে সেরে আয়।

—ভানু যদি এসে পড়ে?

—কেপ্পোনের ধাড়া! পয়সা খরচের ভয়ে সে ব্যাটা পায়ে হেঁটে আসছে। পৌছাতে ঢের দেরী। যা—চট্পট্ যা! ব'লে পাশের বাড়ীর রকের ওপর বসে অরুণ একটা সিগারেট ধরালে।

সাবিত্রীদের সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

যমুনার ছোট ভাই বেরিয়ে এসে দেখলে—জহর একটা লেখা স্লিপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—খোকা! এই স্লিপখানা—

খোকার মুখে খৈ ফুটলো, আমি খোকা নয়—কড়ি। ভাল নাম—প্রণয়কুমার।

জহর খোকার চনমনে ভাব আর চটপটে কথা শুনে থ' হ'য়ে গেল। ঢোক গিলে বললে, বাঃ চমৎকার নাম। এই কাগজখানা তুমি গিয়ে তোমার যমুনাদিকে দিয়ে আসবে! এবার যেদিন আসবো—সেদিন তোমার জন্যে চক্‌লেট নিয়ে আসবো। যাও—যাও—তাড়াতাড়ি যাও! খুব সাবধান—কেউ না দেখতে পায়!

—আপনার নাম জিজ্ঞেস করলে কি বলবো?

—ঐ যে—ঐ কাগজে লেখা আছে। ব'লে জহর দূরে ভানুকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে গলির ভিতর ঢুকে পড়লো।

—কড়ি তার প্যাণ্টের পকেটে স্লিপটা রাখলে জহরের গমন পথের দিকে চেয়ে। তাইতো—ভদ্রলোক অমন চোরের মত ছুটলো কেন!

কড়ি বাড়ীর ভেতর ঢুকতে যাবে—হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ডাকলে, খোকা! শোন!

কড়ি দেখলে—আগেরই মত আর একটি ভদ্রলোক একখানি স্লিপ হাতে নিয়ে তাকে ডাকছে।

—আঃ আমার নাম খোকা নয়—কড়ি—কড়ি—প্রণয়কুমার।

—বুঝেছি, আর কোনদিন ভুল হবেনা। তা ভাই কড়ি—খুড়ি—খুড়ি—প্রণয়কুমার! একটা কাজ করবে? করুণ কণ্ঠে বললে ভানু।

—কাজ! কি কাজ?

—এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। এই কাগজখানা শুধু তুমি তোমার সাবিদিকে পৌছে দেবে?

—এখানা দেবো সাবিদিকে?

—চুপ্ চুপ্ আস্তে !

কড়ি চাপা গলায় ভানুকে জিজ্ঞেস করলে, আপনার নাম কি ?

ফ্যাসাদে ফেললে তো ! জেরায় দেখছি পুলিশ কোর্টের উকিলকেও হার মানালে ছোঁড়া !

—ওকি চলে যাচ্ছেন কেন ? নামটা ব'লে যান।

—আমার নাম ? আমতা আমতা ক'রে মাথা চুলকোতে লাগলো ভানু।

—আমি এতটুকু ছেলে—আমার নাম আছে আর আপনার নাম নেই !

—আমার নাম হচ্ছে—জানি না।

—'জানি না' বুঝি কারুর নাম হয় ?

—আগে স্লিপটা দিয়ে এসো তারপর নাম বলবো।

—আর একজনের মত যেন পালিয়ে যাবেন না। ব'লে কড়ি ভিতরে চলে গেল।

কড়ি গেল কিন্তু ভাবিয়ে দিয়ে গেল ভানুকে। 'আর একজন'টা আবার কে ! 'পালিয়ে'ই বা গেল কেন ! ভাবতে ভাবতে ভানুকেও তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হলো—নইলে কড়ি ফিরে এসে এখুনি তার নাম জিজ্ঞেস করবে। ভানু এসেছিল সাবিত্রীর খোঁজে'—খবরটা একবার যদি সাবিত্রীর মাসী রাজলক্ষ্মী দেবীর কানে ওঠে তাহলে শ্রীমতীর লাঞ্ছনার আর অন্ত থাকবে না।

ওপরে উঠতে উঠতে সিঁড়ির মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেল কড়ি। প্যাণ্টের ' পকেট থেকে দু'টো স্লিপ বার করলে। সাবিত্রীর স্লিপটার দিকে চেয়ে বললে, এটা হচ্ছে যমুনাদির। আর যমুনার স্লিপটার দিকে চেয়ে বললে, এটা হচ্ছে সাবিত্রীদির।

আবার দু' পকেটে দু'টো স্লিপ রেখে কড়ি রেডিয়োয় শোনা একটা গানের কলি গাইতে গাইতে ওপরে উঠতে লাগলো :—

"ভগবান ও ভগবান !
কাঙালের চক্ষু ফেটে রক্ত ঝরে
দেখেও তুমি দেখ না।

আমাদের এই পাড়ার ধনীরা

সব প্রসাদ গড়ে ॥

—এই নাও যমুনাদি তোমার চিঠি। ব'লে ভান্নুর দেওয়া সাবিত্রীর স্লিপখানা কড়ি এগিয়ে ধরলে যমুনার দিকে।

ভান্নুর স্লিপখানা পড়ে আত্মবিস্মৃত যমুনা অপূর্ব বিস্ময়ে নিজের মনে বলে উঠলো উচ্ছ্বসিত আনন্দে, এঁ্যা—ভানুদা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান!

—কি বিড় বিড় করে নিজের মনে বকছো!

—ভাখো কড়ি, তোমার সাবিদিকে এ চিঠির কথা খবরদার বলো না বুঝেচো? এ্যাত্তো বড় একটা কেক আমি তোমার জন্যে আনবো।

—সত্যি আনবে—না ধাপ্পা!

—নি—শ্চ—য় আনবো।

—মনে থাকে যেন, নইলে—! যেন নগদ কেক হাতে পাওয়ার আনন্দে হাসতে হাসতে কড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বহুদিনের বাঞ্ছিত দেবতা আজ বাঞ্ছা-কল্পতরু হয়েছেন, অপ্রসন্ন দেবতা আজ হ'য়েছেন তার প্রতি প্রসন্ন! এ আনন্দ কি রাখবার ঠাঁই আছে ভুবনে! বহু ডাকেও যে দেবতা সাড়া দেয়নি আজ সেই দেবতা তাকে ডাক দিয়েছে। এতো দিনে হলো বুঝি প্রেম-পূজারিণীর প্রেম-পূজা সার্থক!

যমুনার মনের দুকূল বেয়ে উছলে উঠলো আনন্দধারা। রতির দুয়ারে আজ মদন দিয়েছে হানা।

ভান্নুদা লিখেছে স্লিপে :—

"ইউনিয়ন পার্কের উত্তর কোণে আজ বৈকাল পাঁচটায় আসা চাই।"

ইতি—

তোমারি ভান্নুদা

১৮।৭।৫৩

যমুনা দুরু-দুরু বুকে স্লিপখানা চেপে ধরলে। চোখে তার আনন্দাশ্রু

টল্‌মল্ কচ্ছে। কল্পনার ছবি আজ বাস্তবে রূপান্তরিত হতে চলেছে! যা ছিল অসম্ভব—তাই আজ সম্ভবে পরিণত হ'তে চলেছে। এ আনন্দ আজ কোথায় লুকাবে তার কুমারী মন!

যমুনা ভানুর স্লিপখানা বুকের মধ্যে জামার তলায় লুকিয়ে তাড়াতাড়ি বসলো প্রসাধনে। কত কথা—কত গান—কত ব্যথা বুকে তার জমাট বেঁধে আছে; যৌবনের রুদ্ধ দ্বারে আজও তারা মাথা ঠুকে মরছে, আর্ত্ত হাহাকারে বলছে অহর্নিশি—খুলে দাও এ বদ্ধ কারা—হে প্রেম-পূজারী!

আজ পূজারী এসেছে দ্বারে। খুলে যাবে—খুলে যাবে আজ সে দুয়ার। যমুনা আজ চোখের জলেনিবেদন করবে তার—

নাঃ প্রসাধন করা তার হয়ে উঠলো না। চোখের ধারায় সব গেল ধুয়ে, মুছে, একাকার হয়ে! একি জ্বালা! ধৈর্য্য তার কিছুতে মানে না মানা।

প্রসাধন ছেড়ে সাজগোজে মন দিতে চেষ্টা করলে যমুনা। যত তাড়া করে তত যায় সব এলোমলো হয়ে। নাঃ এ শাড়ীর সঙ্গে এ রঙের ব্লাউজটা ঠিক খাপ খাচ্ছেনা। আবার বদলাতে হয়। শাড়ী পছন্দ হয় তো ব্লাউজটা লাগে বেমানান, আবার ব্লাউজ গায়ে ফিট করে তো শাড়ীখানার জৌলুস ম্লান ব'লে মনে হয়। অভিসার চিরদিন অভিশপ্ত।

না হলো মনের মত প্রসাধন, না হলো পছন্দ মত সাজগোজ, ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো যমুনা ঘর থেকে।

সাবিত্রী বিছানায় শুয়ে কি যেন পড়ছিল, কড়ি গিয়ে হাজির। বই থেকে মুখ না তুলে সাবিত্রী বললে, কি খবর, কড়িবাবু?

—পিওন! কড়ির মুখে বাল-সুলভ দুষ্টুমির হাসি।

—পিওন!

—হ্যাঁ—আমি পিওন হয়ে এসেছি।

—পিওনের ব্যাগ কোথায়? রহস্য করে জিজ্ঞাসা করলে সাবিত্রী।

—ব্যাগ নেই, পকেট। এ-ই নাও! ব'লে কড়ি তার প্যাণ্টের পকেট থেকে জহরের দেওয়া স্লিপখানা বের করে সাবিত্রীর হাতে দিলে।

স্লিপে লেখা :—

"ইউনিয়ন পার্কের দক্ষিণ কোণে আজ বৈকাল পাঁচটায় দেখা করলে খুসী হবো।"

ইতি—

আপনারই

জহর

১৮।৭।৫৩

চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সাবিত্রী বললে নিজের মনে, এতখানি স্পর্দ্ধা! আমাকে লিখেছে কিনা পার্কে গিয়ে নিরালায় তার সঙ্গে দেখা করতে! ষ্টুপিড!

—বাঃ রে, আমাকে বকছো কেন? আমাকে যে দিলে! কড়ির অভিমান-ভরা চোখের কোণে জল।

আপনাতে আপনি ফিরে এলো সাবিত্রী। জোর করে মুখে তার হাসির আভা ফুটিয়ে তুলে সস্নেহে বললে কড়ির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, দুর বোকা। তোকে কেন বকবো।

—ঐ তো দাঁতে দাঁত চেপে বললে, ইস্টুপিট্! আমি বুঝি বুঝিনি!

—না রে—না—তোকে বকিনি। বকেছি—যে স্লিপটা তোকে দিয়ে গেছে—তাকে! বুজেছিস!

কড়ির এক চোখে কান্না আর অন্য চোখে হাসি। চোখ বড় বড় করে কড়ি বললে, ওঃ আমি মনে করেছি—আমাকে বকলে।

—ভাখ্—লক্ষ্মি ভাইটি! এই চিঠির কথা কাকেও বলিসনি। কেমন—? এক ঠোঙা চক্লেট দেবো।

—ঠিক দেবে তো—না ধাপ্পা!

—না রে না, ধাপ্পা নয়। নিশ্চয় দেবো।

—ইনক্লাব—জিন্দাবাদ! চক্লেট—কেল্লামাৎ! বলতে বলতে কড়ি সাবিত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্লিপখানা আবার পড়লে সাবিত্রী। রাগে, দুঃখে, অপমানে গণ্ড তার

লাল হ'য়ে উঠলো। অপমানের জ্বালায় চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল জমে উঠলো। কি করবে—ঠিক করতে পাচ্ছেনা সাবিত্রী। ছিঁড়ে ফেলবে স্লিপখানা টুকরো টুকরো ক'রে—না জুতো দিয়ে মাড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

কিন্তু কোনটাই করলে না সাবিত্রী। স্লিপখানা সে বালিসের তলায় লুকিয়ে রাখলে। গুম খেয়ে সে বসে রইলো গালে হাত দিয়ে। বসে বসে সে ভাবতে লাগলো—জহরের নির্দ্দেশে সে ইউনিয়ন পার্কে যাবে কি যাবে না! যাওয়া তার উচিত কিনা! তার দেওয়া নির্লজ্জ স্লিপখানা অগ্রাহ্য করে এড়িয়ে যাওয়া মানে নিজের কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দেওয়া। শুধু কাপুরুষতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া নয়—সঙ্গে সঙ্গে জহরকেও প্রশ্রয় দেওয়া। না—এ হতেই পারে না। যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হলে কুকুর শায়েস্তা হয় না!

ওঃ! বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবার সাধ! ননসেন্স! রাস্‌কেলটাকে বুঝিয়ে দেবো যে কলেজটা প্রজাপতির বৈঠক নয়! ওখানে মেয়েরা ফ্লার্ট করতে যায় না সবাই! গুণ্ডামি মানেই বীরত্ব নয়! ভানুদার সঙ্গে রেষারেষি, গুণ্ডামি করে জহর চায় তরুণী-হৃদয় জয় করতে! ইডিয়ট! ওকে আজ এমন উচিত শিক্ষা দেবো—যা ওর চিরজীবন মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে! জীবনে আর কোন দিন ভুলেও যেন কোন মেয়েকে অভিসারিকা করে নিরালায় ডাকবার দুঃসাহস না হয়!

প্রসাধনের কোন বালাই নেই। মূর্ত্তিটা যেন রঙ্গিণী। চুলটা এলো খোঁপা করে আধুনিক ধাঁচে ঘাড়ের কাছে ঝুলিয়ে নিলে। অতি সাধারণ একটা শাড়ী পরে স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে গট্ গট্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো সাবিত্রী।

সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হলো যমুনার সঙ্গে।

—এমন মানোয়ারী গোরার মত কোথায় চললি রে সাবিদি?

উত্তর দেবার মত মনের অবস্থা তার নয়। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে সত্যি কথা বলায় বিপদ আছে। মাসীমা ব্যাপারটা শুনলে অন্যভাবে ঘুরিয়ে একটা

কদর্থ ক'রে বসতে কতক্ষণ! আর যমুনা যা মেয়ে—তিলকে তাল করে লাগাবার একখানি। এই তো সেদিনের কথা—ভানুদাকে কেন্দ্র ক'রে যমুনা কি কাণ্ডই না করে বসলো। মাসীমার কাছে লাঞ্ছনার একশেষ!

—তুই এত সাজগোজ করে কোথায় চলেছিস?

—আমি! থতিয়ে গেল যমুনা। নিজেকে মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললে, সি—সিনেমায়। আর তুই?

—জু! জুয়ে যাচ্ছি সত্যিকার জানোয়ার দেখতে! বলতে বলতে সাবিত্রী ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

কিছুই বুঝলে না যমুনা! জু-গার্ডেনের দরজা তো এখন বন্ধ হবার সময়, তা ছাড়া জু-গার্ডেনে তো লোকে জানোয়ার দেখতেই গিয়ে থাকে—এ আর এমন নতুন কথা কি! কিন্তু 'সত্যিকার জানোয়ার' কথাটার মানে কি? কে জানে—! ওর যেন সবটাই হেঁয়ালী।

তবে কি—তবে কি—সন্দেহ জাগলো যমুনার মনে। শুধু সন্দেহ নয়—ভয়ও হলো। ভানুদার স্লিপের কথা ওকি কিছু টের পেয়েছে! তাই কি আগুন-খাকীর মত আমার আগেই ছুটে গেল ভানুদার কাছে। তবে কি সে—না—অসম্ভব। ভানুদার আকুল আহ্বান কিছুতেই সে উপেক্ষা করতে পারেনা, তাকে যেতেই হবে প্রিয়-সন্নিধানে।

"ধিন—তেরে—কেটে—তাক। ধিন—তেরে—কেটে তাক। আজ খাবো চক্‌লেট—কাল খাবো কেক্!" বলতে বলতে এসে কড়ি যমুনার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললে, আমার কেক্ আনতে কিন্তু ভুল না হয়!

—কেক্! স্মিত হাস্যে বললে যমুনা।

—বাঃ রে, পিওন হয়ে তোমায় চিঠি এনে দিলুম যে! কেক দেবে না?

—আর চকলেট?

—সে দেবে সাবিত্রীদি।

—কেন—তার অপরাধ? আমার আনলি চিঠি আর সে দেবে চকলেট!

—বাঃ রে, তারও যে চিঠি বয়ে এনেছি। তাইতো সাবিদি চকলেট দেবে

বলেছে! যাও—যাও তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। কড়ি যমুনার হাত ধরে টানতে টানতে দরজার ধারে নিয়ে এলো।

—সাবিদিকে কে চিঠি দিয়ে গেল?

—তা জানি না। নাম বললে না।

যমুনা আরো হয়তো কিছু জিজ্ঞাসা করতো কিন্তু সে সুযোগ ছেলেটা দিলে না। কড়ি নিজের খেয়ালে ছুটে অন্যদিকে চলে গেল।

মহা চিন্তায় পড়লো যমুনা। এমন প্রহেলিকাময় চিঠির সমস্যা তার জীবনে কোন দিন আসেনি। সে ভাবতে ভাবতে পথে নেমে এলো।

ইউনিয়ন পার্কের দক্ষিণ কোণ। ঘাসের ওপর জহরের দলের জটলা বসেছে। তীর্থের কাকের মত ওরা যমুনার আসা-পথ চেয়ে বসে আছে। পোড়া সিগারেটের টুকরোয়—চিনেবাদামের খোসায়—ঘুগনির ছোট ছোট শালপাতায় ওদের সুকঠিন ধৈর্য্যের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

সবার চোখ—বিশেষ করে জহরের—কেন্দ্র ক'রে রেখেছে পার্কের দক্ষিণ দিকের ছোট্ট গেটখানি। যে কোন মেয়েছেলেকে ঢুকতে একবার দেখলে হয়; প্রথম দৃষ্টিতে ওদের মনে হয়—ঐ বুঝি এলো যমুনা। কিন্তু কত মেয়েছেলে পার্কে এলো গেল—এলোনা শুধু যমুনা। ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝিবা এবার ভাঙে।

সিগারেটটা আধখানা খেয়ে বিরক্তভাবে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জহর বললে, কৈ-বাবা, এখনো তো মিসিবাবার দেখা নেই।

সান্ত্বনা দেয় বন্ধুরা, যা ট্রামে-বাসে ভিড়!

—তায় আবার মেয়েছেলে!

অজিতের কথা বলার ধরণে হেসে উঠলো সবাই। যমুনা যে মেয়েছেলে—এই অমোঘ সত্য কথাটা সে যেন এতক্ষণ পরে ওদের স্মরণ করিয়ে দিলে।

—আসল কাজের কাজ যেন না ফস্‌কায়। যমুনার সঙ্গে আজ আমার বিয়ের কথাটা কিন্তু পাকাপাকি করে ফেলা চাই, বললে জহর।

—তোকে জামাই করার সুমতলব ওর মার যদি না থাকে—তখন ?

—আমাদের মা, দিদিমা, ঠাকুরমার বিয়ে হ'য়েছে তাদের বাপ, মা, দাদ কাকার মতে, কিন্তু এ যুগের মেয়েদের বিয়ে হয় তাদের নিজেদের মতে যমুনা যদি রাজি হয় তাহলে সাধ্য কি ওর বাপ-মার অন্য মত করার ! জেদে গলায় জাহির করলে জহর।

— গাছে না উঠতেই এক কাঁদি !

– ওই – ওই – ওই এসে গেছে।

– দূর—ও আর কে !

— আরে – না – না, ঐ তো যমুনার শাড়ীর আঁচল দেখা যাচ্ছে।

– সর্বনাশ ! ও যে—ও যে সাবিত্রী।

সাবিত্রী ক্ষিপ্রপদে এসে ওদের সামনে হাজির হ'য়ে গেল। কারো মু কোন কথা নেই—সবাই যেন পাথর হ'য়ে গেছে। অন্তরের অন্তরতম কো আনন্দের ঝিলিক-ও যে না খেলে গেল—এমন কথাও হলপ করে বলা যায় ন কিন্তু ডাকা হলো যমুনাকে—এসে গেল সাবিত্রী !

জহরের স্বাক্ষরিত স্লিপটা জহরের সামনে ধরে ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে সাবি বললে, কোন্ অধিকারে আপনি আমাকে এ স্লিপ পাঠিয়েছেন ?

—আমি—মানে আমি আপনাকে—, বলতে বলতে জহর স্লিপখা সাবিত্রীর হাত থেকে নিয়ে পড়ে দেখলে। ঠিকই তো—এতো তা শ্রীহস্তাক্ষর। কিন্তু এ স্লিপ এর কাছে গেল কি করে !

—কি, উত্তর দিচ্ছেন না কেন ? আমি শুধু জানতে চাই যে এটাই কি ভদ্রত

দস্তরমত দমে গেল জহর। শুকনো ঠোঁট দুটোর ওপর জিভটা একব বুলিয়ে নিলে নিজের অজান্তে, মোলায়েম কণ্ঠে বলতে চেষ্টা করলে, আপনি-মানে আপনি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ কচ্ছেন। এদের জিজ্ঞাসা করুন-স্লিপটা পাঠানো হ'য়েছিল নমিতা দেবীকে।

—ও সব সাক্ষী সাবুদ আমি মানতে চাই না। আপনিই বলুন—আম কাছে তবে স্লিপটা গেল কেমন করে।

—কেমন করে গেল—সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন। মোট কথা—দোষ আমার কিছুমাত্র নেই।

—দোষের কাজ যদি কেউ ক'রে থাকে—তবে সে পত্রবাহক।

অজিত এবার সাহসে ভরে করে এগিয়ে এসে বললে, স্লিপটার ওপর অনুগ্রহ করে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিন, তাহলেই দেখতে পাবেন—আপনার নাম ওতে লেখা নেই।

সবার সমর্থন পেয়ে জহরের বুকের বল ফিরে এলো, বেশ স্পষ্ট গলায় সে এবার জানিয়ে দিলে, অতএব বুঝতে পাচ্ছেন—ভুল আমার হয়নি, হ'য়েছে আপনারই।

অজিত সরস কণ্ঠে বললে, তাতে কি হ'য়েছে। ভুল মানুষেরই হয়। মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। ভবিষ্যতে শুধরে নিলেই—

—থামুন আপনি! অতটুকু এককোঁটা একটা ছেলেকে দিয়ে চিঠি চালাচালি করতে আপনাদের লজ্জা করেনা!

পাপু অন্যদিকে চেয়ে কাকে যেন এতক্ষণ লক্ষ্য কচ্ছিল। হঠাৎ সাবিত্রীর দিকে চেয়ে ব'লে বসলো, জহর যে আপনাকে সত্যিই ডেকে পাঠায়নি—আপনি তার সঠিক প্রমাণ চান?

—নিশ্চয় চাই।

—তবে ঐ উত্তর কোণে চেয়ে দেখুন—প্রমাণ বসে রয়েছে। আরো দেখুন—জীবন্ত প্রমাণ একটি ওরই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—অভিসারিকার নৃত্য ছন্দে!

সাবিত্রী বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে সে দিকে চেয়ে দেখে মুহূর্ত্তে নিশ্চল পাথর হ'য়ে গেল।

পার্কের উত্তর কোণ। ভানু বেঞ্চের ওপর বসে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শূন্যের পানে। যমুনা ক্ষিপ্রপদে এসে আবেগভরা কণ্ঠে ডাকলে, ভানুদা!

চমকে উঠলো ভানু যমুনাকে দেখে। বিস্ময় ফুটে উঠলো তার চোখে, মুখে, সর্ব্বাঙ্গে। বিস্মিত কণ্ঠে বললে, তুমি—মানে—মানে আপনি!

ভানুর গা ঘেঁসে বসলো যমুনা। ভানু একটু সরে বসলো তারা ছোঁয়া বাঁচিয়ে। ঈষৎ ব্যথাভরা ন্যাকামির নাকিসুরে বললে যমুনা, আপনি অমন অাঁতকে উঠলেন কেন?

—আমি ভাবলাম বুঝি—

—সাবিত্রী!

—হ্যাঁ—মানে—না। বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভানুর মাথায় দুষ্ট সরস্বতী ভর করলে। মিথ্যাকে সত্যের আবরণে ঢেকে দিয়ে বেশ সরস, স্বচ্ছ কণ্ঠে বললে ভানু, মানে—ঐ সাবিত্রী—আপনার সাবিদি! ওকে আমি মনে-প্রাণে মোটেই পছন্দ করিনা। কিন্তু বাধ্য হ'য়ে মিশতে হয়—, অভদ্র তো হ'তে পারিনে। আমি যাকে চাইনা—সে যদি ছিনে জোঁকের মত গায়ে এসে কামড়ে বসে তখন কি করতে ইচ্ছে যায় বলুন তো। তখন তার হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে আত্মহত্যা!

—ওমা—সে কি কথা!

—তাছাড়া আর অন্য উপায় কি বলুন? তবে হ্যাঁ—একটা উপায় আছে। সেটা হচ্ছে—ওর সংস্পর্শে নিজেকে তিলে তিলে মরণের মুখে এগিয়ে না দিয়ে ওকেই হত্যা করা। কিন্তু বুঝতেই পাচ্ছেন—সে কাজ আমি পারবো না, আমার দ্বারা পারা সম্ভব নয়।

—তাই বুঝি আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? বলে যমুনা ভানুর গা ঘেঁসে এগিয়ে বসতে চেষ্টা করলে। ভানু ঈষৎ সরে বসলো।

—আপনাদের সাবিত্রী—কিছু মনে করবেন না—বড় গায়েপড়া মেয়ে! প্রশ্রয় পেলে তো আর কথাই নেই। বলে ভানু ওর মুখের দিকে চাইলে।

প্রশ্রয় পেয়ে বসলো যমুনা। উৎসাহভরা কণ্ঠে বললে, যা বলেছেন। ও আমাদের একটা বিশ্রী গলগ্রহ। সত্যি কথা বলতে কি—ওর জ্বালায় আমরা বিব্রত।

—সাবিত্রী তাহলে একটি পরগাছা ?

—আমার মাসীমা মারা যাবার পর ওতো আমাদের সংসারেই মানুষ। আমরা আশ্রয় না দিলে—এতো দিনে কোথায় ভেসে যেতো! আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠবার কি ওর আগ্রহ! মা ওকে হু' চক্ষে দেখতে পারেন না।

ভানু একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকাতে চেষ্টা করলে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে। বললে তাচ্ছিল্য ভরে, শুধু আপনার মা কেন—অনেকেই,—আমিও!

উল্লসিত হ'য়ে উঠলো যমুনা। আর একটু সরে বসলো ভানুর গা ঘেঁসে। ভানু সরতে সরতে তখন প্রায় বেঞ্চির শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছে।

—আপনার স্লিপ পেয়ে প্রথমটা তো আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। তারপর আমার কি সে আনন্দ—তা আর আমি আপনাকে কি বলবো! বলে খুসীভরা লাজ-নম্র চোখে যমুনা ভানুর চোখের ওপর চোখ তুলে চাইলে।

—আনন্দটা খুবই হলো বুঝি ?

—বাঃ রে, তা আর হবে না!

—তারপর ?

—বুঝলাম—, এতদিন আপনি আমাকে যে অবহেলা করে এসেছেন,—সেটা আপনার আন্তরিক নয়, মৌখিক—মানে বাহ্যিক। যমুনার মুখে আত্ম-সমর্পণের সে কি মধুর কারুণ্য।

—এত দেরীতে বুঝলেন!

সলজ্জ হাসি হাসলে যমুনা। বলবার আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না। ক্ষণেক নীরবতার মধ্য দিয়েই কাটলো। অস্বস্তিকর স্তব্ধতা হঠাৎ ভঙ্গ করে ভানু বললে, ভুল হয়েছে আপনার।

যমুনা বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে ভানুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। কি সে বলতে চায়—? ভুল! এ আবার কি প্রহেলিকা!

—কি ভুল হয়েছে ?

—আগাগোড়াই ভুল।

—তার মানে?

—তার মানে—আপনি অত্যন্ত গায়েপড়া মেয়ে!

—আমি! আপনি আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ–হ্যাঁ–আপনাকে।

—আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

—না বোঝবার তো কিছু নেই। পরিষ্কার মাতৃভাষায় কথা বলছি। আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন অনুগ্রহ করে। ব'লে ভানু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলো।

—ডেকে এনে আপনি আমায় অপমান কচ্ছেন?

যমুনার কথায় আসন্ন কান্নার সুর।

—বিশ্বাস করুন বা নাই করুন—আমি আপনাকে ডাকিনি আর ভবিষ্যতে কোনদিন ডাকবার মত সৎ ইচ্ছাও নেই। বাপরে বাপ—মাথা ধরে গেল। বলে ভানু দু' হাতে তার রগ চেপে ধরলে।

—এতক্ষণ তাহলে এ অভিনয়ের কোন্ প্রয়োজন ছিল! আপনি তাহলে সাবিদিকে দেখা করার জন্যে স্লিপ পাঠিয়েছিলেন?

—অবান্তর প্রশ্নের জবাব আমি দিই না। মোট কথা—আপনাকে যে আমি ডাকিনি তার প্রমাণ হাতে-হাতে দিয়ে দিচ্ছি। ঐ দেখুন—কারা এগিয়ে আসছে এদিকে। এখুনি ভজিয়ে দিচ্ছি।

ভজাভজি করার মত ধৈর্য্য তার নেই। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভ ও অভিমানে দেহ আর মন দুটোই তার জর্জ্জরিত, কণ্টকিত হ'য়ে উঠেছে। উঃ, একি নিদারুণ, মর্ম্মান্তিক অপমান! চোখের উদ্গত অশ্রু আর বুঝি রোধ করা যায় না। যমুনা আর একটা কথাও বলতে পারলে না—প্রায় ছুটে চলে গেল গেটের দিকে।

অরুণের দল—সঙ্গে সাবিত্রী—এগিয়ে এলো ভানুর কাছে।

—তাহলে হ'য়ে যাক ভজাভজিটা? ভানুর দিকে চেয়ে বললে দলপতি অরুণ।

—ওকি—যমুনা—মানে উনি ওরকম রেগে চলে যাচ্ছেন কেন? জিজ্ঞেস করলে জহর যমুনার গমন পথের দিকে চেয়ে।

—আরে মশাই—বিপদের কথা আর কেন বলেন। শুকনো ঝামেলা। ওকে কে ভালবেসে স্লিপ পাঠিয়েছেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই—উনি এসে আমার ওপর চড়াও। জোর করে ভালবাসিয়ে ছাড়বে! কি বিপদ বলুন তো!

ভানুর রসিয়ে কথা বলার ধরণে সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো— সাবিত্রীও বাদ গেল না।

—আচ্ছা বরাত নিয়ে এসেছিলেন, মশাই। বললে অজিত ভানুর উদ্দেশে সাবিত্রীর দিকে আড় চোখে চেয়ে।

—তা উনি চলে গেলেন কেন?

—সাফ্ জবাব পেয়ে—স্রেফ সরে পড়লেন। ব'লে ভানু একটা সিগারেট ধরালে।

—প্যাকেটটা পকেটে না পুরে এগিয়ে দিন! বলতে বলতে অজিত ভানুর হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে সবার হাতে এক একটা করে সিগারেট বিতরণ করলে।

জহর বললেন, শুনলেন তো? এবার বিশ্বাস হলো—না আরো কিছু প্রমাণ চান? ওকি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—বসুন!

—ঠিক আছে। বলে সাবিত্রী বেঞ্চির গায়ে ঠেস দিয়ে দাড়াল।

সানুনয়ে অরুণ বললে, একটা সত্যি কথা বলবেন ভানুবাবু? উই আর অল ফ্রেণ্ডস্ হিয়ার।

—প্রশ্নটা জটিল বলে মনে হচ্ছে।

—কিছুমাত্র নয়। সাবিত্রীদেবী জানতে চান যে আপনি তাঁকে স্লিপটা পাঠিয়েছিলেন—কি না।

—বাঃ রে, আমি কেন জানতে চাইবো? সাবিত্রীর কণ্ঠের সুর মিঠেকড়া।

—আপনি মানে আপনি ঠিক নয়—আমরা।

ভানু বললে তার হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে চেয়ে, সোজা কথা হচ্ছে—

আপনারা যদি যমুনাকে স্লিপ পাঠিয়ে থাকেন তাহলে আমি অবশ্য সাবিত্রীকে একখানা ছোট্ট স্লিপ পাঠিয়েছিলাম!

—দেখলেন সাবিত্রীদেবী! স্লিপ ওলোট-পালোট হ'য়েই সব গণ্ডগোল—ম্যাটিং চকার! বলে অরুণ সহাস্য মুখে সাবিত্রীর দিকে একবার আর ভানুর দিকে একবার চাইলে।

সাবিত্রীর মুখের ভাব বদলে গেছে। রাগ, ক্ষোভ মুছে গিয়ে সেখানে ভেসে উঠেছে ভীতির ছায়া। টেনে টেনে সাবিত্রী বললে, ও নিশ্চয় মাসীমাকে সব কথা বলে দেবে!

—ওসব ভাবনায় এখন গুলি মারুন। আসুন সব এই ঘাসের গালিচার ওপর গুলজার করে বসা যাক্! কি বলেন—ভানুবাবু? এ্যাই কুলপী বরফ! ইধার আও! বলতে বলতে অজিত আগেই ঘাসের ওপর বসে পড়লো।

অজিতের দেখাদেখি সকলেই ঘাসের ওপর গদিয়ান হ'য়ে বসলো।

ভানু বসতে বসতে সাবিত্রীকে বললে, মিছে ভেবে কোন লাভ নেই। যা হবার তা হবে। বসে পড়।

ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ! রথটা পড়ে কুপোকাৎ। বলতে বলতে কড়ি এসে ঘরে ঢুকলো।

—কৈ—আমার চা?

—এই নাও! ব'লে কড়ির বাবা শ্যামবাবু নিজের কাপ থেকে খানিকটা চা ডিসে ঢেলে ওর দিকে এগিয়ে ধরলেন।

কড়ির মা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী পাশের সোফায় বসে একটা সোয়েটার বুনছিলেন।

কড়ি বললে, কার সোয়েটার মা?

—তোমার দিদির।

—আর সাবিদির? সেও তো দিদি। তাকে সোয়েটার বুনে দেবে না?

—যমুনার যে সোয়েটারটা ছোট হ'য়ে গেছে—সেটাই তাকে দেবো। বললেন রাজলক্ষ্মী।

—পুরোণো সোয়েটার সাবিদি নিলে তো! মুখ মচকে বললে কড়ি।

—তোর ছেলেমুখে বুড়ো কথা কেন রে! যা এখান থেকে দুষ্টু ছেলে। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন রাজলক্ষ্মী।

—খালি বকাবকি আর খালি বকাবকি! বাপ্‌রে বাপ্! বলতে বলতে কড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রাজলক্ষ্মী ছেলের যাওয়ার ভঙ্গি দেখে মৃদু হাসলেন।

শ্যামবাবু বললেন, ওরা হচ্ছে স্বাধীন দেশের ছেলে। বয়স হিসেবে বুদ্ধির দিক থেকে একটু পাকা হবেই।

—তাতো বুঝলাম কিন্তু মেয়েগুলি যে দিনকে-দিন ধিঙ্গী হ'য়ে উঠছে—তাদের কথা কি কিছু ভাবছো? বললেন রাজলক্ষ্মী।

একটা চুরুট ধরালেন শ্যামবাবু। দেহটা সোফায় এলিয়ে দিয়ে বললেন, ওদের ভাবনা ওরা এখন নিজেরাই ভাবছে। আমি বুড়ো মানুষ, আধুনিক মেয়েদের ভাবনা আমি আর কি ভাববো।

—ওসব বাজে কথা রাখো। আমি যা বলি তাই শোন। ভানুর সঙ্গে যমুনার খুব মনের মিল। আর দেরী না করে—ওদের বিয়েটা—

—তা কি করে হয়। আমি যে শুনেছি ঠিক তার উল্টো।

—উল্টো! উল্টো মানে?

—মানে—ভানুর সঙ্গে যমুনার নয়—সাবিত্রীরই ইয়ে—যাকে বলে বন্ধুত্ব। বলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন শ্যামবাবু।

—এসব বাজে কথা কার কাছে শোন বলতো! ছেলেমেয়ের মনের কথা আমার চেয়ে কি তুমি বেশী বোঝ?

রহস্যঘন কণ্ঠে স্মিতহাস্যে শ্যামবাবু বললেন, তা আর কেমন করে বুঝবো বল। যৌবন একদিন তোমারই একচেটে ছিল—আমি তো গোড়া থেকেই বুড়ো।

—আমি কি তাই বললাম নাকি। নাঃ বুড়ো হ'য়েও তোমার ঝগড়া করা রোগ গেল না।

—ভুলে গেছলাম—ঝগড়া করাটা যে তোমাদেরই একচেটে—একথাটা একেবারেই ভুলে গেছলাম। বলে শ্যামবাবু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

ডাক-পিওনের বলার অনুকরণে কড়ি বলতে বলতে ঢুকলো, বাবু, চিঠি আছে!

রাজলক্ষ্মী পুত্রের হাত থেকে চিঠি নিয়ে বললেন, যাও—অনেকক্ষণ খেলা হ'য়েছে এবার পড়োগে!

—তোমরা বসে বসে গল্প কচ্ছো আর আমাকে বলছো—পড়োগে!

—ফের কথার ওপর কথা বলে!

—দেখনা বাবা—মা খালি খালি বকছে!

কড়ির মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে শ্যামবাবু বললেন, কি করবি বাবা—চিরদিন মায়ের জাত ওরকম বকেই থাকে। আমাকেই সময় অসময়ে বকাবকি কচ্ছে—আর তুই তো কাঃ কথা।

—আর আদিখ্যেতা করে না, ওকে যেতে দাও। চিঠি পড়া শেষ করে বললেন রাজলক্ষ্মী।

—যাও, সন্ধ্যে হ'য়ে এলো—এবার মাষ্টার মশাই আসবেন। বই নিয়ে বসোগে। বললেন সস্নেহে শ্যামবাবু।

কড়ি চলে গেল।

চিঠিখানা দেখিয়ে রাজলক্ষ্মী বললেন, এই ছাখো—কি কাকুতি-মিনতি করে চিঠি লিখেছে রঙপুরের সেই দোজপক্ষের জমিদার। আর দেরি না করে—সাবিত্রীর সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে দাও।

আঁতকে উঠলেন শ্যামবাবু, কি সর্বোনাশ—সে ভদ্রলোক যে প্রায় আমার বয়সী, বরং দু' একবছরের বড় বইতো ছোট নয়।

—তাতে কি!

—তাজ্জব ব্যাপার। এখনো তার বিয়ে করতে সাধ যায়!

—আমি না থাকলে তোমারও বিয়ে করার সাধ যেতো!

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে শ্যামবাবু বললেন, গুরু রক্ষে করেছেন যে তুমি আজও আছো।

—ঠাট্টা তামাসা রাখো। লোকটার অঢেল পয়সা, এ সুযোগ হেলায় হারায় না। বলে সম্মতির প্রত্যাশায় রাজলক্ষ্মী সাগ্রহে শ্যামবাবুর মুখের দিকে চাইলেন।

ক্ষণেক স্তব্ধতার মধ্যে শ্যামবাবু যেন হঠাৎ একটা গূঢ় সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। কৃত্রিম গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, তা এক কাজ কর না কেন, টাকা যখন অঢেল তখন সাবিত্রীর সঙ্গে না দিয়ে যমুনার সঙ্গে ঐ বুড়োর বিয়েটা দিয়ে দাও না!

—বুড়ো হলে মানুষের ভীমরতি হয়! আমি টাকার লোভে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবো ঐ ঘাটের মড়ার সঙ্গে! তোমার কি একটুও—ঝঙ্কৃতকণ্ঠে বলতে বলতে রাজলক্ষ্মী সোফা থেকে উঠে দুম-দুম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শ্যামবাবু স্ত্রীর গমনপথের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। চুরুটটা মুখে দিয়ে চোখ বুজে ধূমপান করতে লাগলেন।

দিন দশেক পরের কথা। চায়ের টেবিলে বসে মা আর মেয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা হচ্ছে। কথার কেন্দ্র হচ্ছে সাবিত্রী। প্রেম-প্রতিদ্বন্দিনী সাবিত্রীকে মায়ের কাছে খেলো করার আপ্রাণ চেষ্টা কচ্ছে যমুনা। কান্‌পাতলা লোক রাজলক্ষ্মী শুনতে শুনতে সাবিত্রীর ওপর ক্ষেপে উঠছেন। শেষকালে চিঠির কথা শুনে তিনি একবারে জ্বলে উঠলেন, বটে! সাবিত্রী তাহলে আজকাল চিঠি পর্য্যন্ত চালাচালি সুরু করেছে! মেয়েটা একেবারে বয়ে গেল!

ইন্ধন যোগালে যমুনা, তারপর সেদিন পার্কে গিয়ে একপাল ছেলে আর ভানুবাবুর সঙ্গে কি যে কেলেঙ্কারী কাণ্ড মা—তা আর তোমায় কি বলবো! বলা তো দূরের কথা—ভাবতেই মা আমার লজ্জা হচ্ছে।

—নাঃ ভানুটার মাথা ওই মেয়েটাই বিগড়ে দিলে! অমন সোনার চাঁদ ছেলে—

ইনিয়ে বিনিয়ে যমুনা বললে, তুমি তো জানো না মা—ওঁর কীর্ত্তি! কলেজে গিয়ে সাবিদি যা করে—

—কি করে শুনি?

লজ্জাবতী লতা হয়ে গেল যমুনা। অনুনাসিক কণ্ঠে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে. তা তুমি জানতে চেয়ো না মা—বলতে আমার লজ্জা করে!

—কলেজে গিয়ে শুধু ভানুর আশ-পাশে ঘুর ঘুর্ করে ঘুরে বেড়ায়—এই তো! ও সব আমি বুঝি! লজ্জা সরমের বালাই ওর নেই।

—ভানুবাবুর সঙ্গে মিশতে ওকে বারণ করে দিও মা। কলেজের ছেলে-মেয়েরা ওদের নিয়ে যা-তা ঠাট্টা তামাসা করে। শুনতে আমার বড় বিশ্রী লাগে—যাকে বলে মাথা কাটা যায়।

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল যমুনা, শ্যামবাবু বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন, জানো—বড় মোলায়েম ছেলে। পথে আমার সঙ্গে দেখা হতেই আভুমি নমস্কার! ভারি ভাল ছেলে।

—ভানুর কথা বলছো? বললেন রাজলক্ষ্মী।

—তবে আর কার কথা বলবো। তোমাকে মাসীমা আর আমাকে মেসো-মশাই বলতে অজ্ঞান। এমন ছেলে—বুঝলে কিনা—হাজারে একটা মেলে। ব'লে শ্যামবাবু একটা চুরুট ধরালেন।

—আমাদের সাবিত্রীকে তার সঙ্গে দেখলে?

—দেখলাম বইকি। কি একটা শক্ত অঙ্ক বুঝে নিতে সে তাদের হোষ্টেলে গেল।

ভু' চোখ কপালে তুলে রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, এ্যাঁ—বল কি! লোক-লজ্জার মাথা মেয়েটা একেবারেই খেতে বসেছে! ছিঃ ছিঃ, কালে কালে হলো কি! এই ভরসন্ধ্যে বেলা—

—কেন—তাতে হ'য়েছে কি?

—হ'য়েছে তোমার ভীমরতি! বলে রাজলক্ষ্মী যমুনার দিকে চেয়ে বললেন, যা তো মা—এক কাপ চা তৈরী করে নিয়ে আয় তো।

যমুনা ঠোঁটের কোণে চোরা হাসি হেসে চলে গেল।

শ্যামবাবুর দিকে ঈষৎ ঝুঁকে বসে অপেক্ষাকৃত চাপাগলায় বললেন রাজলক্ষ্মী, যদি নিজের ভাল চাও তো আমার কথা এখনো শোন। রঙপুরের ঐ দোজপক্ষের জমিদার নগদ দশ হাজার টাকা গণে দিয়ে সাবিকে ঘরে তুলতে চায়।

—কিন্তু কারণ?

—আঃ, কি করে যে অতগুলো পাশ করেছিলে তা তো বুঝি না। কারণ হচ্ছে—সাবিত্রীর রূপের চটক-টাতো আছে। তাই দেখেই বুড়োর এত আগ্রহ।

— বেশ—বুঝলাম। আর কি বোঝাতে চাও?

—তাই বলছি—ঐ জমিদার বুড়োর সঙ্গে সাবিত্রীর বিয়ে দাও আর তার দেওয়া ঐ দশ হাজার টাকা ভানুকে বরপণ হিসেবে দিয়ে ওর সঙ্গে যমুনার বিয়ে দাও।

সোজা হ'য়ে বসলেন শ্যামবাবু। বললেন, বেশ পরিষ্কার, স্বচ্ছ কথা। না বোঝবার কিছু নেই। মনে কর—সাবিত্রীর বিয়েও দিলাম ঐ বুড়োর সঙ্গে, কিন্তু আসল কাজের কাজ তাতে কিছুই হলো না।

—কেন?

—তোমার টাকার লোভে ভানু বিয়ে করলে না যমুনাকে।

—রাখো তোমার এসব মনগড়া কথা! তা বুঝি আবার হয়! টাকায়—

বাধা দিয়ে শ্যামবাবু বললেন, টাকায় ভোলবার ছেলে আর যেই হোক—ভানু নয়। বিনাপণে কলার পাতায় চাল ঢেলে সে সাবিত্রীকে বিয়ে করবে—তবু দশ লক্ষ টাকা পণ নিয়ে তোমার মেয়ে যমুনাকে বিয়ে করবে না।

—তার মানে?

—এত কথার মানে বোঝ আর এই ছোট্ট কথাটার মানে বুঝতে পাচ্ছো না? ব'লে মুখটা স্ত্রীর কানের কাছে নিয়ে এসে শ্যামবাবু চাপাগলায় বললেন, ওদের ভেতর লাভ হ'য়েছে। বুঝলে!

কঠোর কণ্ঠে রাজলক্ষ্মী বললেন, হুঁ—কিন্তু হাকিম নড়বে তবু হুকুম নড়বে না। যমুনাকে ভানু বিয়ে করে ভাল—নইলে সাবির সঙ্গে তার বিয়ে হবে না—

হবে না—হবে না। দেখি কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে—, কথা অসমাপ্ত রেখে রেগে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

—আর যার থাক—আমার ঘাড়ে তো নেই! বলে শ্যামবাবু চুরুটটা মুখে দিলেন, চোখ বুজে শোফায় এলিয়ে দিলেন দেহটা।

—বাবা চা এনেছি।

—মাথা যায় যাক—প্রাণটাতো রাখি! দে মা—! বলে চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিলেন শ্যামবাবু।

হোষ্টেলে বসে ভানু গালে হাত দিয়ে ভাবছে। সমস্যা খুবই জটিল এবং গুরুতর; অথচ সমস্যা সমাধানের কোন পন্থাই সে খুঁজে পাচ্ছে না। এমন জীবন-মরণ সমস্যা একা শুধু ভানুর কেন—অনেকের জীবনেই এসেছে। কাজেই এ ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে কোন বৈচিত্র নেই, অবশ্য কতকটা আছে ঐ সমস্যা সমাধানের মধ্যে।

—একা চুপ-চাপ বসে বসে কি ভাবছো, দাদাবাবু?

কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল দেবুর আবির্ভাব। মানসিক অবস্থা ভানুর ভাল নয়। কোন জবাব না দিয়ে সে নীরবেই বসে রইলো।

—কথা বলছো না যে!

—আঃ, কথা বলবার থাকলে তবে তো বলবো। বিরক্তির সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো ভানুর কণ্ঠে।

সহজে ছাড়বার পাত্র দেবু নয়। সে আরো কাছে এসে বললে, নিজের ভাববার বিষয়বস্তুটি ভাষায় প্রকাশ করে বললেই তো কথা হ'য়ে উঠবে!

—দিন কয়েক হোষ্টেলে আর কলেজের আশ-পাশে ঘোরা-ঘুরি করেই যে দেখছি দার্শনিক হ'য়ে উঠলে!

—সেটা আমার দোষ নয়—সংসর্গের। যাক, আপাততঃ কি ভাবছো—তাই বল!

—কিছু না।

—কিছু না তো—

—বিরক্ত করো না—যাও এখান থেকে।

—সাবিত্রীদির কথা যখন-তখন ভেবে শুধু শুধু মন খারাপ করে লাভ কি বল!

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে ভানু বললে রসসিক্ত কণ্ঠে, ভাল হবে না কিন্তু দেবুদা!

—উঠো না—স্থির হ'য়ে বসো। ভুল কচ্ছো কেন—দাদাবাবু, আমি যে সব সময় তোমার পিছনে ছায়ার মত আছি। সব কিছুই বুঝি আমি।

হাসলে ভানু। দেবুদার চেয়ে নিকটতম, নিবিড় আত্মীয় কে আর আছে এ জগতে! ছোট ভায়ের মত সে তাকে ছেলেবেলা থেকে কোলে-পিঠে মানুষ করে এত বড়টা করে তুলেছে। ষোল বৎসর পেরিয়ে যাওয়ার সুযোগে আজ ভানু তার দেবুদার সঙ্গে বন্ধুবৎ আচরণ করে। দেবুদার কাছে গোপন তার কিছু নেই। তবে লজ্জার ভাবটা এখনো ভালভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

—কি করা যায় বলতো, দেবুদা! ধনুকভাঙা পণ করেছেন সাবিত্রীর মাসীমা। তিনি কিছুতেই সাবিত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না।

ভানু যতটা গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো বললে—ঠিক ততটা হাল্‌কাভাবে অদৃশ্য দেবু বললে, বেশ—দেবেন না। আমি অন্য জায়গায় তোমার বিয়ে দেবো।

—আহা, আমি তো আর আমার কথা ভাবছি না। কিন্তু সাবিত্রীর অবস্থাটা তাহলে কি হবে জানো? রঙপুরের এক বিয়ে-পাগলা জমিদার বুড়োর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেবে ওর মাসীমা।

—ভালই তো হবে। তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার চেয়ে সাবিত্রীদি ওখানে মনের সুখেই থাকবে।

—ছাই থাকবে! সুখে থাকা দূরে থাক—ও তাহলে সেখানে গিয়ে মরেই যাবে। খেদোক্ত কণ্ঠে বললে ভানু।

—কেমন করে তুমি তাহলে সাবিত্রীদিকে বাঁচাবে? জিজ্ঞেস করলে অদৃশ্য দেবু।

—কি মুস্কিল! সেই কথাই তো তোমায় জিজ্ঞেস কচ্ছি।

—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

—না—তুমি কথা দাও যে, যেমন করে হোক সাবিত্রীকে বাঁচাবে! মিনতি-ভরা কণ্ঠে ছলছল চক্ষে বললে ভানু।

—সাবিত্রীদিকে বাঁচানো মানে তোমাকে বাঁচানো অর্থাৎ তোমার সঙ্গে সাবিত্রীর বিয়ে দিয়ে দেওয়া—এই তো?

—সবই তো বোঝ—তবে আবার শুধু শুধু কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছো, দেবুদা!

—আচ্ছা—যাহোক একটা উপায় করা যাবে। আপাতত তোমার সব কিছু ভাবনা আমার ওপর চাপিয়ে তুমি জামা কাপড় পরে বেরিয়ে পড় দেখি!

—কোথা যাবো?

—নাঃ, তোমার দফা একেবারে রফা। আজ যে তোমাদের কলেজ ইউনিয়ন—সে খেয়াল আছে। যাও—যাও—চট্পট্ বেরিয়ে পড়।

—ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলে! ফাঙ্সানটার কথা আমি একেবারে ভুলেই গেছি। বলে তাড়াতাড়ি ভানু সাজগোজে মন দিলে।

সাজ-পোষাক শেষ করে ভানু বললে, দেবুদা! আছো?

—কোথা আর যাবো?

—কেন—আমার সঙ্গে কলেজ ইউনিয়নে চল না। কত গান—নাচ—

—কলকাতায় এসে ও সব আমি ঢের শুনেছি—ঢের দেখেছি। তোমাদের কলেজ ইউনিয়ন—তুমি যাও। সাবিত্রীদি এতক্ষণে এসে গেছে। ওখানে তোমায় না দেখতে পেলে—শেষকালে এই হোষ্টেলে এসে হানা দেবে। অদৃশ্য দেবুদার কণ্ঠস্বরে হাসি পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো।

—ওঃ তামাসা হচ্ছে—আচ্ছা, আমি তাহলে চলি। দোহাই তোমার—আমার কথাটা কিন্তু ভুলো না, দেবুদা!

—রাধামাধব! তুমি নির্ভরলায় যেতে পারো। আমার খেল আমি আজই সুরু করে দিচ্ছি। অদৃশ্য দেবুর শেষ কথাটা বোধ হয় ভানুর কানে গেল না।

কলেজ ও হোষ্টেলের মধ্যবর্ত্তী খোলা বিরাট প্রাঙ্গনে মেরাপ বাঁধা হয়েছে। মণ্ডপের শেষ প্রান্তে ষ্টেজের মত উঁচু প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্মের সামনে নিমন্ত্রিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়দের বসবার আসন। কলেজের পুরাতন ও নূতন ছাত্র-ছাত্রীদের আজ ইউনিয়ন। সারা মণ্ডপে আর তিল ধারণের স্থান নেই। সারা মণ্ডপ লোকে লোকারণ্য।

ফাঙসানে যাঁরা যোগদান করবেন তাঁদের আসন স্বতন্ত্র। প্ল্যাটফর্মের একাংশে সভাপতি শ্রীধীরাজ দাস আর প্রধান অতিথি হিসাবে এসেছেন বিখ্যাত গায়ক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। তা'ছাড়া আছেন কর্ম্মকর্ত্তার দল আর সম্পাদক সমীরদা।

সামনের আসনে গণ্যমান্য অতিথিদের মধ্যে দেখা গেল শ্যামবাবু আর তাঁর মিসেস রাজলক্ষ্মীকে।

যথাসময়ে সভাপতি বরণ আর প্রধান অতিথির অভ্যর্থনা হ'য়ে গেল।

সভার কাজ সুরু হবার আগে সম্পাদক সমীরদা উপস্থিত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে করজোড়ে বললে, সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে আপনাদের কাছে নিবেদন করি যে, বর্ত্তমানে আমাদের কলেজে দু'টি দল আছে। সেই দুই দলের মিলনই আজ আমাদের এই ফাঙসানের প্রথম এবং প্রধান আইটেম্। আপনারা যদি অনুমতি করেন তাহলে দুইদলের সভাপতির আমরা হাতে হাত মিলিয়ে দিই আপনাদেরই সামনে। বলে সারা মণ্ডপের ওপর সমীর চোখ বুলিয়ে নিলে।

সারা মণ্ডপ একবাক্যে ধ্বনিত হয়ে উঠলো, সানন্দে! সানন্দে!

সমীর ডাকলে, এসো ব্রাদার্স!

অরুণ আর ভানু এগিয়ে এলো। সভাপতি মশাই উভয়ের হাতে হাত

মিলিয়ে দিলেন। বললেন, আজকের এই ইউনিয়নে তোমাদের সকলের মধ্যে ইউনিটি স্থাপিত হোক—এই আমার আন্তরিক কামনা।

অরুণ আর ভানু করমর্দন করে সভাপতিকে নমস্কার জানিয়ে সরে গেল। সভায় হাততালি পড়লো।

—এইবার স্যার—আমাদের সভার কাজ সুরু হোক। বলে কর্মসূচীখানা সভাপতির দিকে এগিয়ে ধরলে।

ধীরাজবাবু আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে স্মিতহাস্যে ধনঞ্জনবাবুর দিকে চাইলেন। বললেন, আমি আজকের প্রধান অতিথি ধনঞ্জয়বাবুকে একখানি গান গেয়ে উৎসব উদ্বোধন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধনঞ্জয়বাবু আসন ছেড়ে প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে মাইকের দিকে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাততালি পড়লো। ধনঞ্জয়বাবু যথারীতি নমস্কার জানিয়ে গান সুরু করলেন। অপূর্ব সঙ্গীত! সভায় উপস্থিত জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেললে। গান শেষ হতে সবার যেন চমক ভাঙলো। হাততালি পড়লো, তবে অনেকেই ভুলে গেলেন হাততালিতে যোগ দিতে।

সভাপতি মশায় দাঁড়িয়ে উঠে ঘোষণা করলেন, এবার আমাদের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী পলাতকা চাকলাদারের ভৈরবী নৃত্য!

পলাতকা নৃত্যছন্দে এসে নমস্কার জানিয়ে নৃত্য সুরু করে দিলেন। তার ওপর দিয়ে বয়ে গেল বিভিন্ন রঙের বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানি। অতি চমকপ্রদ অপূর্ব নৃত্য! লীলায়িত নৃত্যের মধ্যে আছে মানুষকে মুগ্ধ করার অপূর্ব উপাদান।

নৃত্য অন্তে সভাপতি মশাই ঘোষণা করলেন—তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী সাবিত্রীর গান।

গান সুরু হলো। অনেকেই গানের তারিফ করলেন কিন্তু সহ্য করতে পারছিলেন না রাজলক্ষ্মী। "রোগী যেন নিম খায় নয়ন মুদিয়া" গোছের করে তিনি আসনে বসে অস্বস্তি বোধ কচ্ছিলেন। উভয়-সঙ্কট আর কাকে

বলে! না পারেন উঠে যেতে আর না পারেন সুস্থ হয়ে বসে থাকতে। ভাবটা হচ্ছে—মাগো! গানের ছিরি ছাখো না! ওর নাম কি আবার গান নাকি! অর্থাৎ যে যাকে না দেখতে পারে তার চলনটাই বাঁকা—এই আর কি!

গান কিন্তু শেষ হবার আগেই এক উৎকট এবং উদ্ভট ব্যাধি এসে আক্রমণ করলে রাজলক্ষ্মীকে। একি জ্বালা! থেকে থেকে কাঁইকুতু লাগে কেমন করে! মানুষের কাছে বলবারও নয় আর কইবারও নয়। মুস্কিল তো! কাঁইকুতুর জ্বালায় অস্থির হ'য়ে উঠলেন রাজলক্ষ্মী।

শ্যামবাবু স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, অমন উস্‌-খুস্ কচ্ছো কেন—স্থির হ'য়ে বসো না? লোকে যে মুখ চাওয়া-চায়ি কচ্ছে!

—তোমার যেমন কথা, উস্‌-খুস্ আবার কোথায় করলাম। চেয়ারটায় বড্ড ছারপোকা কামড়াচ্ছে তাই একটু নড়ে চড়ে বসছি। মুখে বললেন রাজলক্ষ্মী কিন্তু 'যার ব্যথা যেথানে—হাত পড়ে তার সেথানে!' রাজলক্ষ্মীর আসল ব্যথার খবর যদি জানতেন শ্যামবাবু তাহলে আর এ ধরণের সাবধান বাণী উচ্চারণ করে স্ত্রীকে 'স্থিরো ভব' হতে বলতেন না।

কি মুস্কিল! আবার কাঁইকুতু! এত লোকের মাঝে মহা বিপদগ্রস্ত করলে তো! কাঁইকুতু লাগার কি একটা সময়-অসময় নেইরে বাপু! নাঃ ভদ্রতা বাঁচানো দায় হ'য়ে উঠলো।

গান শেষ হলো। হাততালির চোটে সারা মণ্ডপে যেন পায়রা উড়ে গেল। রাজলক্ষ্মী মুখ মচকালেন। এঃ, এ গানে আবার হাততালি!

—কই—হাততালি দিলে না?

স্বামীর দিকে কটমট্ করে চাইলেন রাজলক্ষ্মী—পাশে উপবিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল। কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে রাজলক্ষ্মী হাততালি দিয়ে বসলেন। ব্যাপারটা হলো আরো হাস্যকর কারণ তথন ইট্ ইজ টু লেট্! হাততালির সময় পেরিয়ে গেছে।

এবার সুরু হলো যমুনার তরঙ্গ নৃত্য। আনন্দে দিলহারা হ'য়ে গেলেন রাজলক্ষ্মী। তবু একটা ছোট্ট 'কিন্তু' তাঁর মনের কোণে উকি মারতে লাগলো। সেটা আর কিছুই নয়—এত দেরীতে যমুনার নাচ না দিয়ে—সাবির আগে দিলেই হতো! যমুনার নাচের কাছে সাবির গান! আরে ছোঃ, কিসে আর কিসে—মোটে তুলনাই হয় না। ও কি, নাচতে নাচতে যমুনা অমন আঁতকে উঠছে কেন? কতকটা যেন কাঁইকুতু লাগার মত। ওকে কি আবার ঐ রোগে ধরলো নাকি! ধরলো ধরলো—একটু দেরি করে ধরলেই পারতো! মা আর মেয়ের দেখছি প্রায় একই সময় একই রোগ! কি জ্বালা বলতো! কাঁইকুতুর জ্বালায় অমন সুন্দর নাচটাই মাটি হ'য়ে যেতে বসেছে। এঃ, ওধার থেকে কারা যেন টিট্‌কিরি দিচ্ছে। ওমা, সামনের দুটো মেয়ে কি বেহায়া গো! যমুনাকে দেখিয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে কি চাপা হাসিই-না হাসছে। মানুষের কাঁইকুতু লাগলে অমন হ'য়েই থাকে,—এর মধ্যে অত ঢলাঢলির কি আছে! পিছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে যমুনাকে নাচ থামিয়ে বসতে বলছে। কারা কারা যেন ছেলেটাকেই আবার সমর্থন করলে। তোদের অত মাথাব্যথা কেন রে বাপু? তোদের ভাল না লাগে চুপচাপ্ বেরিয়ে গেলেই পারিস।

মধ্যপথে নৃত্য শেষ করতে বাধা হলো যমুনা। মুখটি কাঁচুমাচু করে ঘাড় হেঁট করে মায়ের পাশে এসে বসে পড়লো।

জহর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ঈষৎ চাপা গলায় বললে, নাচতে নাচতে আপনি অমন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিলেন কেন?

—কে যেন কাঁইকুতু দিচ্ছিল!

জহর অবাক হ'য়ে বললে, কাঁইকুতু! কৈ—কাকেও তো কাঁইকুতু দিতে দেখলাম না!

—আমিও তো কাকেও দেখলাম না অথচ কাঁইকুতুর জ্বালায় নাচ আমি শেষ করতে পারলাম না।

—আ-মর, ব'লেই রাজলক্ষ্মী অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করলেন। এবার তাঁর পালা। সংক্রামক ব্যাধির মত কাঁইকুতু তাঁকে পেয়ে বসেছে। দাঁতে

দাঁত চেপে ধরলেন তিনি নিজের হাস্যকর অবস্থা অপ্রকাশ্য রাখবার জন্য। কিন্তু জহরের দৃষ্টি তিনি এড়াতে পারলেন না।

জহর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে বসলো, মাসীমার শরীর কি অসুস্থ?

—আঃ যত আপদও এসে জোটে! আমার শরীর সুস্থ হোক আর অসুস্থ হোক—তোদের অত খোঁজে কাজ কিরে বাপু! আত্মীয়তা করার আর সময় পেলে না। দাঁত থেকে দাঁত খুলে কথা বলার যে কতখানি বিপদ তাতো আর—! কি আর করবেন। কথা তাঁকে বলতেই হবে। কিন্তু কথা বলতে যাওয়ার আগেই আবার কাঁইকুতু।

—অমন কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে উঠছেন বারে বারে—আপনি কি অসুস্থ মাসীমা?

বিরক্তিভরা কণ্ঠে রাজলক্ষ্মী বললেন, ছিলুম না—এখানে এসে হলুম।

সভাপতি ভানুর নাম ঘোষণা করলেন—কিছু বলবার জন্য।

ভানু প্ল্যাটফর্মে উঠে নমস্কার করে সবিনয়ে বললে, মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা আর আমার ভ্রাতা ও ভগিনীবৃন্দ। দেখুন, সভায় দাঁড়িয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে বড় শক্ত কাজ,—পরীক্ষা দেওয়ার চেয়ে শক্ত। আমি শুধু একটা কথা আমার বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিই যে একতাই বল! সেই বল আজ আবার আমরা ফিরে পেয়েছি। আজ আমরা সবাই এক। মনের মিলের আর এক নাম প্রেম।

শেষ লাইনটা বলতে বলতে ভানুর চোখ গিয়ে পড়লো সাবিত্রীর ওপর। অবশ্য এটা তার স্বেচ্ছাকৃত নয়। চার চোখে চোখাচোখি হতেই কেমন একটা অজানিত শিহরণ বয়ে গেল ভানুর দেহ ও মনে। নিজেকে এক লহমায় সামলে নিয়ে ভানু দু' হাত কপালে তুলে সমবেত জনমণ্ডলীর উদ্দেশে বললে, জয় হিন্দ!

শ্রোতৃমণ্ডলীর হাততালিতে সারা মণ্ডপ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো।

সভাপতি সভাভঙ্গের নির্দেশ দেবার পূর্বেই শ্যামবাবুর হাতে একটা রাম-চিমটি

দিয়ে রাজলক্ষ্মী আসন ছেড়ে উঠলেন। গোবেচারী শ্যামবাবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীর অনুগামী হলেন। কাঁইকুতু ব্যাধি তখনও তাঁকে ছাড়েনি বরং পেয়ে বসেছে বেশী করে।

কলেজ ইউনিয়নের ফাংশান শেষ হয়ে গেছে সকাল সকাল। সন্ধ্যা সবে সাতটা। হোষ্টেলে ফিরে এলো ভানু—সঙ্গে সমীর আর পশুপতি।

ভানুর পিছনে সমীর গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকলো,

"শুন রজকিনী রামী—
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।"

—এখানে কেইবা চ—চ—চণ্ডীদাস আর কেই বা রা—রা—রা—রামী!

—তোমার নামের শেষাংশটুকু বাদ দিয়ে প্রথমাংশটুকুই রাখা উচিত ছিল। এই সোজা কথাটা আর তোমার মগজে ঢুকছে না!

ভানু বললে, ওর কথা বাদ দাও সমীরদা। মাথাটায় ওর গোবর ভরা। এত করে ওকে রোদে রোদে ঘুরতে বারণ করি তবু যদি আমার কথা কানে তুলবে! আমার কি—কোনদিন বলতে কোনদিন ওর ওই মাথা ভর্ত্তি গোবর রোদে শুকিয়ে ঘুঁটে হ'য়ে যাবে। তখন বাছাধন টেরটা পাবেন। ওরে বোকা! আমি হচ্ছি চণ্ডীদাস আর রামী হচ্ছে—

চেঁচিয়ে উঠলো পশুপতি, বু—বু—বুঝেছি—বুঝেছি। রামী হচ্ছে সা—সা—সাবিত্রী।

—উঃ কি সাফ মাথা রে! বললে ভানু ওর মাথায় একটা চাঁটি দিয়ে।

—বাট্ হোয়ার ইজ মাই জুলিয়েট? আমার জুলিয়েটের দেখা আমি কোথায় পাবো? বলতে বলতে সমীর তার সিটে চিৎ হ'য়ে হতাশভাবে শুয়ে পড়লো।

—তোমার জু—জু—জুলিয়েটের সন্ধান আজও মিললো না?

—কোথায় আর মিললো। দেখছো না—জীবনটা মরু হ'য়ে যেতে বসেছে।

ভানু সহাস্য মুখে বললে,

হোয়েন লভ ইজ দাই ওনলি এম্!
দেন ট্রাই ট্রাই এ্যাণ্ড ট্রাই এগেন্।

উঠে বললো সমীর। অতি বড় দার্শনিকের মত বললে, সেই আশাতেই তো আজও প্রাণটা রেখেছি, ব্রাদার। চল—আপাততঃ গা-হাত-পা ধুয়ে প্রাণটা একটু শীতল করি।

—তোমরা যাও—আমি একটু জিরিয়ে নিই।

—এসো হে পশুবাবু, আমরা এগোই। বলে সাবান, টাওয়েল নিয়ে সমীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—হরি হে মা - মা - মা - মাধব।

—চা - চা - চা - চান করবো
না-গ্রা ধো—ধো—ধোব!

বলতে বলতে পশুপতি সমীরকে অনুসরণ করলে।

ভানু চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালে। সিগারেটের ধোঁয়ার রিঙ্ তৈরী করতে করতে শূন্যের পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, দেবুদা আছো?

—বল—হুজুরে হাজির আছি। পাশ থেকে ভেসে উঠলো অদৃশ্য দেবুর কণ্ঠস্বর।

—আজকের ব্যাপারটাতো ঠিক বুঝলাম না।

—কিসের ব্যাপার? স্বচ্ছ, স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে দেবু।

—ঐ যে গো—ঐ কাঁইকুতুর।

—আমিও ঠিক বুঝলাম না। তবে ঝিন্-ঝিনিয়ার মত কোন উট্‌কো অসুখ-বিসুখ হবে আর কি! আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল দেবু—অরুণের দল হুড়মুড় করে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

—কার সঙ্গে কথা বলছেন?

—নিজের সঙ্গে।

—নিজের সঙ্গে?

—কেন—শোনেননি? আমি তো মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে কথা বলে থাকি। ছেলেবেলা থেকে এটা আমার একটা মুদ্রা-দোষ। তারপর?

অরুণ বললে, যা শুনলাম তা কি সত্যি?

—কি যে শুনেছেন তা না শুনে সত্যি-মিথ্যে কেমন করে বলি বলুন!

—মানে অতি বড় কঠোর কথা! শুনে সত্যি কথা বলতে কি—আমাদের সবার খুন চেপে গেছে। বলতে বলতে অরুণ তার হাতের আস্তিন গুটিয়ে ফেললে।

—কিন্তু কি শুনে আপনাদের খুন চাপলো তাতো বুঝলাম না।

—শুনলাম—সাবিত্রীদেবীর সঙ্গে আপনার বিয়ে দিতে নাকি তাঁর মাসীমা রাজি নন?

—ঠিক শুনেছেন।

অজিত থিয়েটারী ঢঙে বললে, দেখুন ডিয়ার! আমরা সব সহ্য করতে পারি শুধু সহ্য করতে পারি না প্রেমের অপমান। আমরা আছি শুধু আপনার একটা মুখের কথার অপেক্ষায়।

—অনুমতি দিন—আমরা সদলে গিয়ে শ্যামবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে রাজি করে আসি।

স্মিত হাস্যে ভানু বললে, সানন্দে!

—চলে এসো সব। বলে দিগ্বিজয়ী বীরের মত অরুণ তার দল-বল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভানু ডাকলে, দেবুদা।

—বল।

—কি রকম বুঝছো?

—দেখছি আমে দুধে তোমরা তাহলে সব সত্যি-সত্যি মিশে গেলে।

সহাস্যে ভানু বললে, তোমার আপত্তি আছে?

—আপত্তি না থাকলেও আনন্দ নেই। কথায় বলে দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার আর দূর থেকে করি নমস্কার! মেশামেশিটা করো তবে একটু তফাতে থেকে।

—তুমি দেখছি ওদের ওপর বেজায় ক্ষেপে গেছ!

—বলা তো যায় না, দিনকাল বেজায় খারাপ। আচ্ছা, আপাততঃ আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে।

—কোথায়—কোথায়?

—জরুরী কাজ তোমাদের থাকতে পারে আর মুক্ষু বলে আমার কি কোন জরুরী কাজ থাকতে পারে না? চললাম। ব'লে অদৃশ্য দেন চলে গেল।

অরুণের দলকে দেখে রাজলক্ষী মোটেই খুসী হলেন না; এমন কি এক কাপ ক'রে চায়ের ব্যবস্থাও ওদের জন্য করলেন না। যমুনার নাচের আগে সাবিত্রীর গানের ব্যবস্থা এরাই করেছিল। শুধু তাই নয়—নাচতে নাচতে যমুনার কাঁইকুতু লাগার জন্য এরাই যেন দায়ী। তার পরের প্রস্তাব শুনে মনে মনে তিনি একবারে তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠলেন—যদিও এদের মুখের প্রস্তাব তাঁর কাছে ভূতের মুখে রাম নামের মত শোনালো। আজকের ইউনিয়নে দুটি বিরোধী দল পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে হস্ত মর্দন ক'রে এক হ'য়ে গেল অর্থাৎ তেলে-জলে মিশে গেল, কিন্তু সত্যি কি কোনদিন তেলে-জলে মিশ খায়!

দার্শনিক প্রফেসরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি বা তর্কাতর্কি করে জয়লাভ করা যতটা সোজা—শ্রীমতী রাজলক্ষীকে হার মানানো ততটা কঠিন, শুধু কঠিন নয়—অসাধ্য। পৃথিবী যদি রসাতলে যায় যাক তবু সিদ্ধান্ত তাঁর চির-অটল।

ঈষৎ বিরক্তিভরা কণ্ঠে অরুণ বললে, আপনি তাহলে ভানুবাবুর সঙ্গে কোন সর্ত্তেই সাবিত্রীদেবীর বিয়ে দেবেন না?

—না—না—না। আর কতবার একই কথা বলবো বাপু তোমাদের? ভানুর ইচ্ছা হয়—যমুনাকে বিয়ে করুক, এই হচ্ছে আমার শেষ কথা—সাফ্ জবাব।

অজিত বললে, কিন্তু সেটা কেমন করে সম্ভব মাসীমা! ভানুবাবুর সঙ্গে

ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে সাবিত্রীদেবীর—যমুনাদেবীর নয়। কাজেই জোর জবরদস্তি করে আর সব চলে—চলে না শুধু চার হাত এক করে দেওয়া, বিশেষ করে এ যুগে!

—কেন—যমুনার সঙ্গে ভানুর ঘনিষ্ঠতা হতেই বা ক্ষতি কি? সাবিত্রীর চেয়ে ওকি কোন অংশে ফ্যাল্‌না!

—দেখুন—আপনাকে আমরা মাসীমা বলি। স্পষ্ট করে বলতে মুখে বাধে। ঘনিষ্ঠতা ঘটানো যায় না জোর করে—ওটা মনের মিলে আপনি ঘটে যায়।

—এ যুগের ছেলে-মেয়েদের বেহায়াপনা আমার ঢের জানা আছে। মনের মিলের কথা তোমরা আমাকে আর শেখাতে এসো না। আমি আমার নিজের মেয়ে ব'লে বলছি না—যমুনার মত গুণের মেয়ে হাজারে একটা মেলে। শুধু ভানুই ওকে চিনলে না।

—আমি ওকে সত্যিই চিনেছি মাসীমা। তা দেখুন—ভানুর না চেনায় কিছুই যায় আসে না। আপনি অনুমতি করলে আমিই যমুনাদেবীকে বিয়ে করতে রাজি আছি। সাগ্রহে সলজ্জ কণ্ঠে বললে জহর।

—তুমি! পোড়া কপাল যমুনার! ওমা—এ আবার কি হলো! গেছি—গেছি—

—কি হলো মাসীমা—কি হলো? কাঁইকুতু লাগার মত অমন কচ্ছেন কেন?

—এ্যাই—এ্যাই সেরেছে! ব'লে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা কচ্ছেন রাজলক্ষ্মী।

—তখন নাচতে নাচতে যমুনাদেবী প্ল্যাটফর্মের ওপর ঠিক আপনার মতই পোজ কচ্ছিলেন।

—আরে বাব্বা—এ যে দম নিতে দিচ্ছে না।

—কিন্তু আপনার হলো কি? জিজ্ঞেস করলে অরুণ।

বিকৃত মুখে ঝঙ্কৃত কণ্ঠে রাজলক্ষ্মী বললেন, কিচ্ছু হয়নি বাবা—কিচ্ছু

হয়নি বাবা। এ্যাই রে—তোমরা এবার উঠতে পারো। আমার শেষ কথা বলা তো হ'য়ে গেছে—আর বসে থেকে বিরক্ত করো না অসুস্থ মানুষটাকে। ওমা—এ্যাই মরেছে—

—আচ্ছা, আমরা তাহলে আজ আসি।

—আজ নয়—একেবারেই! ওরে বাব্বা—এ্যাই সেরেছে। বলে পড়তে পড়তে, টলতে টলতে, হেলতে দুলতে রাজলক্ষ্মী বসার ঘর ছেড়ে ভিতরে চলে গেলেন।

ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বিমর্ষ মুখে, পরাজয়ের গ্লানিভরা মনে শ্যামবাবুর বাড়ী থেকে রাস্তায় এসে নামলো। নীরবে পথ বেয়ে চললো—কারুর মুখে কোন কথা নেই। ব্যথার ধাক্কা সব চেয়ে বেশী লেগেছে জহরের মনে। এমন অপমান—এমন সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান জীবনে তার কোন দিন আসেনি। অন্যত্র হ'লে এই অপমান মুখ বুজে নীরবে সে কিছুতেই সহ্য করতো না কিন্তু এখানে উপায় নেই, রাজলক্ষ্মীর মত সাঙ্ঘাতিক মহিলা 'একমেবাদ্বিতীয়ম কেবলম্

সারা ঘর সিগারেটের পোড়া টুক্‌রোয় ভরে গেছে। অসময়ের কুয়াসার মত ঘরের ভিতরটা পাতলা ধোঁয়ায় ভর্তি। ভানু একবার চেয়ার ছেড়ে উঠছে—একবার বসছে—একবার সারা ঘর পায়চারি কচ্ছে। ভাবটা তার একান্ত অস্বস্তিকর, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার পূর্ব মূহূর্ত্ত।

এ হেন সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে আকস্মিক এবং একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ভানুর ঘরে শ্রীমতী সাবিত্রীর প্রবেশ।

—ভানুদা!

ভানু তখন হতাশভাবে বিছানায় দেহ রেখে দু'চোখ বুজে যার ধ্যানে মগ্ন—যার ছবি ভেসে উঠেছে তার চোখের সামনে—তারই অপ্রত্যাশিত মধুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ভানুর কানে। একি স্বপ্ন—না সত্য! ভানু চোখ খুললে।

—কে? ও—তুমি! বসো! বসো! তা—তা—এখনো বাড়ী ফেরোনি। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—কমন্ রুমে বসে একখানা বই পড়ছিলাম।

—তা হঠাৎ কি মনে করে?

—পড়তে পড়তে হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়ে গেল তাই বাড়ী ফেরার আগে একবার দেখা করতে এলুম।

—এমন মনরাখা কথা বলতে কতদিন শিখেছো?

হেসে উঠলো সাবিত্রী। বললে, সত্যি মিথ্যে আমার চেয়ে আপনারই তো ভাল জানা আছে। পুরাণে পড়েননি, ভক্ত যদি আকুল অন্তরে স্মরণ করে—তাহলে ভক্তের ভগবান তার কাছে কি না গিয়ে পারেন! ধ্যান ভেঙে ছুটে তাঁকে যেতেই হয়—যেমন আসতে হলো আমাকে।

—তার মানে?

—শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে আপনি আমার কথাই ভাবছিলেন, তাই পড়া ছেড়ে তাড়াতাড়ি আমাকে আপনার দুয়ারে ছুটে আসতে হলো। যাক্—ভক্তের মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ করলাম, এবার এক কাজ—বেশ গরম চা খাওয়ান দেখি।

ভানু অতি বড় কৃতার্থের মত তাড়াতাড়ি বঁধুয়াকে ডেকে দু'কাপ চা আনতে বললে। সে যে এতক্ষণ অরুণদের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় একান্ত অস্থির ভাবে সময় কাটাচ্ছিল—সাবিত্রীকে সামনে পেয়ে সে কথা ভুলেই গেল।

ডাক্তার শেষ পর্য্যন্ত ডাকতেই হলো। না ডেকে উপায় কি! কতদিন আর মানুষ নেচে-কেঁদে কাটাতে পারে! এমন বিদখুটে ব্যায়রামই শেষ পর্যন্ত ধরলো যে প্রায় বুড়ো বয়সে শ্রীমতী রাজলক্ষ্মীর আপ্‌সে নাচ শিখে ফেলার অবস্থা। কাঁইকুতুর জ্বালায় নেচে কেঁপে, বেঁকে হেসে অস্থির হয়ে উঠলেন রাজলক্ষ্মী।

শ্যামবাবু ভাবলেন যে, কাঁইকুতুর জ্বালায় হাসতে হাসতে কি শেষ পর্য্যন্ত হার্টফেল করবেন তাঁর গৃহিণী! এ বয়সে গৃহিণী-হারা হয়ে অনাথ হওয়ার মত বিড়ম্বনা দুনিয়ায় আর কিছুই নেই, এ যে কতখানি মর্ম্মান্তিক তা এক তাঁর বয়সী ভুক্তভোগীই অনুমান করতে পারেন। কাজেই স্ত্রীর তাগিদের চেয়ে নিজের তাগিদেই তিনি ডাক্তার ডাকলেন।

ডাক্তার তো এলেন। কিন্তু রোগিণীকে তাঁর পরীক্ষা করাই হ'য়ে উঠলো এক বিপদের কথা। রোগিণী স্থির হ'য়ে বসলে বা শুলে তবে তো ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করবেন! কিন্তু বসছেই বা কে আর শুচ্ছেই বা কে? রাজলক্ষ্মী একবার উঠছেন—একবার বসছেন—একবার সারা ঘর চরকী ঘোরা ঘুরছেন। কাঁইকুতুর জ্বালায় হাসতে হাসতে প্রায় তাঁর কাঁদবার অবস্থা!

একটু স্থির হয়ে না বসলে আমি আপনাকে পরীক্ষা করি কেমন করে? বললেন ডাক্তারবাবু।

কি করে বসি বলুন! পোড়া রোগে আমায় বসতে দিচ্ছে কই! দেখতে তো পাচ্ছেন নিজের চোখে।

ডাক্তারবাবু বললেন, হ্যাঁ তাতো দেখতেই পাচ্ছি।

—পরীক্ষা করার কি আছে! রোগীকে দেখেই যদি রোগ ঠিক করতে না পারলেন—, কথা আর শেষ করতে হলো না রাজলক্ষ্মী দেবীকে—রোগের কাজ সুরু হয়ে গেল।

—ওরে বাপরে—এ্যাই—এ্যাই সেরেছে—! কি আমি করি—এ্যাই—! ইত্যাদি কাঁইকুতু লাগার বুলি আওড়াতে আওড়াতে রোগিণী সারা ঘরখানা প্রায় চষে ফেলবার উপক্রম করলেন।

ডাক্তারবাবু তো স্তব্ধ! শ্যামবাবু একান্ত নিরীহ ভদ্রলোক—বিষম বিব্রত!

—দাঁড়িয়ে দেখছেন কি! যা হোক একটা ওষুধের ব্যবস্থা করুন তাড়াতাড়ি ডাক্তারের উদ্দেশে বললেন রোগিণী।

ডাক্তারবাবু মনে মনে ভাবছেন—কোথায় এসেছি রে বাবা! এতো রোগিণী নয় যেন মহিষমর্দ্দিনী—পৃথিবী পদভরে রসাতলে দায়িনী। যেমন

বিকট চেহারা তেমনি বিদকুটে রোগ। রোগ ব্যাটারও বাহাদুরী আছে—বেছে বেছে ঠিক লোককেই ধরেছে। ওঃ, হুকুম করার ভঙ্গী দেখনা, ডাক্তার যেন ওঁর খাস তালুকের প্রজা। বাকি খাজনা আদায়ের জন্যে গলায় গামছা দিয়ে জমিদারের কাছারী বাড়ীতে পাইক দিয়ে ধরিয়ে আনা হ'য়েছে।

—কি গো! ডাক্তারবাবুকে বাড়ীতে ডেকে এনেছো কি সঙের নাচন দেখাবার জন্যে! রগড়টা খুব জমেছে—না? স্বামীর উদ্দেশে বললেন মিসেস।

বিব্রত চোখে শ্যামবাবু ডাক্তারের দিকে চাইলেন। তিনি কিছু বলবার আগেই ডাক্তারবাবু রোগিণীকে প্রশ্ন করলেন ভয়ে ভয়ে, কুণ্ঠিত হ'য়ে—এ রোগ আপনার আর কোনদিন হ'য়েছিল?

—কস্মিন কালেও নয়। কাঁইকুতু যে একটা রোগ—এ তো ভূ-ভারতে এই প্রথম শুনলাম। ওঃ—ওরে বাবা! এ যে দম আটকে আসার অবস্থা! বলতে বলতে আবার তিনি লাফালাফি দাপাদাপি স্থরু করে দিলেন।

—কাঁইকুতু কি আপনার অনবরতই—মানে চব্বিশ ঘণ্টাই লাগছে, না মাঝে মাঝে?

রোগিণী তখন রোগের প্রকোপে একান্ত বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন। পাছে আবার কি বলতে কি অবান্তর কথা বলে বসেন ডাক্তারের মুখের ওপর তাই উত্তরটা এলো শ্যামবাবুর দিক থেকে।

—না—অনবরত ঠিক নয়, মাঝে মাঝে। বেশ খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরছে-ফিরছে—হঠাৎ স্থরু হ'য়ে গেল। কোন সময় একেবারেই নেই, আবার কোন সময় নিঃশ্বাস ফেলতে সময় দেয় না। এই দেখুন না—এখন বেশ স্থস্থ আছে। ব'লে শ্যামবাবু স্ত্রীর দিকে চাইলেন।

—স্থস্থ না ছাই! এখুনি হয়তো—এ্যাই বুঝি—! না—কিছু না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু! আমার এই ব্যায়রামটার নাম কি বলতে পারেন? ব'লে জিজ্ঞাস্থ নেত্রে রাজলক্ষ্মী ডাক্তারবাবুর দিকে চাইলেন।

প্রমাদ গণলেন ডাক্তার। প্রশ্নকর্ত্তীর যেন সমস্ত রোগের নামই জানা শুধু এই অস্থখটা বাদ দিয়ে। কি উত্তর দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না ডাক্তার।

এমন উৎকট এবং উদ্ভট রোগের সম্মুখীন কোন দিন তাঁকে হতে হয়নি। নাম একটা রোগের যাহোক কিছু বানিয়ে বলে আপাততঃ রেহাই পাওয়া এমন কিছু শক্ত নয় কিন্তু নির্জলা মিথ্যা কথাই বা বলেন কেমন করে, মুখে যে বাধে! পাশ করে তাঁকে ডাক্তার হ'তে হয়েছে, কম্পাউণ্ডার থেকে তিনি তো আর শত-মারী সহস্র-মারী স্বয়ংসিদ্ধ ডাক্তার হ'য়ে ওঠেননি। কাজেই চুপ করেই রইলেন।

তাঁকে এসে উদ্ধার করলে শ্যামবাবুর পুত্র শ্রীমান কড়ি।

—বাবা! বাবা! যমুনাদির অসুখ সুরু হ'য়ে গেছে।

—আবার কি অসুখ রে? দু'চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলেন শ্যামবাবু।

—সেই যে—সেই—সেই কাঁইকুতু! তাই সুরু না হতেই দিদি নেচে নেচে উঠছে। এসো না—দেখবে এসো। ভারি মজার অসুখ। দিদি আপনা আপনি নাচছে—এই যে এই রকম করে। দিদির নৃত্যছন্দটা কড়ি নিজেই নেচে দেখিয়ে দিলে।

—একি ছোঁয়াচে রোগ দেশে এলো বলুন তো, ডাক্তারবাবু। তুমি উঠো না এ শরীরে। বিশ্রাম কর। আমি ডাক্তারবাবুকে নিয়ে গিয়ে যমুনাকে দেখাচ্ছি। তোমাদের মা আর মেয়ের যখন একই রোগ তখন এক প্রেসক্রিপসনেই দু'জনের কাজ হবে। কি বলেন, ডাক্তারবাবু! কথাটা ঠিক বলিনি? আসুন—ও ঘরে গিয়ে মেয়েটাকে দেখে ওষুধটা লিখে দেবেন। বলে ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে শ্যামবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কড়ি গেল পিছনে পিছনে।

মাকে ছেড়ে রোগটা তখন সত্যিই মেয়েটাকে ধরেছে। রোগের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে যমুনা তখন সারা ঘরময় নেচে বেড়াচ্ছে। অহেতুক হাসছে আর মাঝে মাঝে 'ওরে বাবা, এঁ—হে—হে—, আচ্ছা মুস্কিল তো, আঃ একি হলো, ধ্যেৎ বাবা—আর পারিনে!' ইত্যাদি বকতে বকতে নাচা-নাচি, লাফা-লাফি, দাপা-দাপি সুরু করেছে। তার চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে। হাজার অভ্যাস থাক—অনিচ্ছার সঙ্গে মানুষের আর কতক্ষণ নাচবার সামর্থ্য থাকে শরীরে! যমুনা বেশী মাত্রায় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

—এই ছাখো বাবা! দিদি নাচছে। বাঃ রে কি মজা! বললে কড়ি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে।

ডাক্তারবাবুরও হাসি এলো যমুনার অবস্থা দেখে। রোগিণী রোগের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে, চেঁচায়, হাত পা ছোঁড়ে শুয়ে শুয়ে, কিন্তু রোগের জ্বালায় নাচতে কোনদিন তিনি দেখেননি বা শোনেননি। এহেন হাস্যকর অভিজ্ঞতার কথা ডাক্তারি শাস্ত্রে তো কোথাও লেখা আছে ব'লে মনে পড়ে না।

গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে ডাক্তারবাবু বললেন, ছুটোছুটি লাফালাফি না করে বিছানায় শুয়ে থাকুন।

—শুয়ে থাকলে আরো বেশী করে কাঁইকুতু লাগে। এঁ—আঁ—বাবারে—! বলতে বলতে কাঁইকুতু লাগার অঙ্গভঙ্গি করতে লাগলো যমুনা।

—কি বুঝছেন, ডাক্তারবাবু? জিজ্ঞেস করলেন শ্যামবাবু।

—পরীক্ষা করার অবসর না পেলে সঠিক কি বলি বলুন। কষ্ট করে আপনি ছু'মিনিট একটু চুপ করে বসুন! নইলে—

—হে-হে-হে—হি-হি-হি—স্থির হ'তে পাচ্ছি কই! আরে—আবার—আর পারিনে—

—চেষ্টা তো করুন!

যমুনা দাঁতে দাঁত চেপে চেয়ারে বসলো। পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারবাবু প্রস্তুত হ'য়ে ওর কাছে এগিয়ে এলেন। তড়াঙ করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো যমুনা। প্রমাদ গণলেন ডাক্তার। আর একটু হ'লে মেয়েটা টাল খেয়ে ঘাড়ের ওপরই এসে পড়তো। আচ্ছা নাচুনে রোগী তাঁর বরাতে জুটেছে তো!

—এঁকে কেউ একটু জোর করে ধরতে পারলে হোত! শ্যামবাবুর দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন ডাক্তার।

শ্যামবাবু বুড়ো মানুষ। জোয়ান মেয়ের একটি ধাক্কাতেই কুপোকাৎ হবার ভয়ে ঠিক সাহস করলেন না। ভাই, দাদা, কাকা, পিসে, মেসো গোছের নিকটতম আত্মীয় বাড়ীতে তো কেউ নেই। পাশের বাড়ীর পাতানো দাদারা এসে তাঁরই চোখের সামনে যমুনার গায়ে হাত দেবে—তাকে জোর করে চেপে ধরবে,

সেটাও কেমন বিসদৃশ, একান্ত দৃষ্টিকটু। ভেঙ্গে পড়লেন শ্যামবাবু। ডাক্তারও বিব্রত।

অবস্থাটা বুঝলো যমুনা। চেয়ারে বসে হাতলদুটো বেশ শক্ত করে ধরে বললে, কাকেও ধরতে হবে না। আমি ঠিক আছি ডাক্তারবাবু, তবে পরীক্ষাটা একটু তাড়াতাড়ি সারবেন।

ডাক্তার যমুনাকে পরীক্ষা করতে সুরু করলেন খুব সংক্ষেপে। সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা শেষ হবার আগেই যমুনা বললে, বড্ড কাঁইকুতু লাগছে, ডাক্তারবাবু। এঁ-হেঁ-হেঁ—নাঃ, আর পারা গেল না।

যমুনা প্রায় লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠলো, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরে গেলেন ডাক্তারবাবু।

—আসুন! ব'লে ডাক্তারবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পিছনে পিছনে গেলেন শ্যামবাবু।

যমুনার ছট্‌ফটানি আরো যেন বেড়ে গেল। সারা ঘরময় সে দাপাদাপি সুরু করে দিলে। বেচারীর অবস্থা দেখলে সত্যিই মায়া হয়।

দিদির অবস্থাটা কিন্তু কড়ির কাছে বড়ই উপাদেয় এবং উপভোগ্য। সে দূরে দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি মুখে বললে, আবার থামলে কেন! নাচো দিদি—নাচো।

—মারবো টেনে এক থাপ্পড়! বলতে বলতে নৃত্যছন্দে এগিয়ে গেল যমুনা কড়ির দিকে।

—ওরে বাবা! বলতে বলতে কড়ি মারলে টেনে দৌড়।

বাইরে বেরিয়ে এসে শ্যামবাবু কাকুতিভরা কণ্ঠে বললেন, কি বুঝলেন, ডাক্তারবাবু!

—আপনার মেয়ের নার্ভগুলো বড়ই চঞ্চল দেখলাম! চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললেন ডাক্তারবাবু।

—তাতো দেখলেন, কিন্তু অসুখটা কি?

—অসুখ! অসুখটা দুর্বোধ্য। কাজেই চিকিৎসার বাইরে।

—অসুখ অথচ চিকিৎসার বাইরে! আশ্চর্য্য! আচ্ছা—নার্ভ চঞ্চল হলে তার কি কোন ওষুধ নেই?

স্মিতহাস্যে ডাক্তার বললেন, ওটা ঠিক শারীরিক চাঞ্চল্য নয়। ও চাঞ্চল্যের উৎপত্তি হচ্ছে মন থেকে। কাজেই শরীরের চেয়ে মনের চিকিৎসা করাই আগে দরকার।

— সেটা আবার কি রকম চিকিৎসা?

—কিছু মনে করবেন না। আপনার মেয়ে তো দেখলাম অবিবাহিতা! তা কারো সঙ্গে কোন রকম কিছু—? বলে অর্থপূর্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তার শ্যামবাবুর দিকে চাইলেন।

—কোন রকম কিছু—মানে?

—মানে এই প্রেম-টেম আর কি? প্রেম তো একটা মানসিক ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

— কি বলছেন ডাক্তারবাবু! আমার মেয়ে কারুর সঙ্গে প্রেমে পড়েছে! তাহলে—তাহলে আমার স্ত্রীও কারুর প্রেমে পড়েছে বলুন! বলি—ব্যাধিটাতো মা আর মেয়ের একই কিনা!

—এক্সকিউজ মি! সে কথাটা আমি ভেবে দেখিনি। তবে ব্যাধিটা যে বেজায় জটিল—এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

—অথচ আসল ব্যাধিটা ধরা যাচ্ছে না। এখন ধরবার তো একটা উপায় ঠিক করতে হবে। নইলে ঘরে ঘরে এ রোগ একবার ছড়িয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই। সারা দেশ এই আমার বাড়ীর মত তা-ধেই তা-ধেই করে নাচতে সুরু করবে। ব'লে করুণ চোখে শ্যামবাবু ডাক্তারের মুখের দিকে চাইলেন।

—আপনার কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগটা আমাদের মেডিক্যাল বোর্ডে পুট্ করতে হবে।

—হ্যাঁ—খুব শীগগীর পুট্ করুন। দেখছেন তো স্বচক্ষে, কাঁইকুতু রোগ বড় সাঙ্ঘাতিক, মারাত্মক রোগ। একবার ধরলে টেনে ছাড়ানো দায়।

ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না। মেডিক্যাল বোর্ড

যাহোক একটা উপায় স্থির করবেন। আপনি ওঁদের আপাততঃ বেশ বলকারক পথ্যের ব্যবস্থা করুন। তা না হলে অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমের দরুণ ওঁদের স্বাস্থ্য নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে।

—বলকারক বলতে দুধ, ঘি, মাখন, ন্যাসপাতি, আপেল, কলা—তারপর ধরুন গিয়ে—মাছ, মাংস, ডিম—

—ইত্যাদি মুখরোচক পথ্য দিলেই চলবে। আচ্ছা, নমস্কার।

—নমস্কার! আপনার এই ফি-টা। বলে টাকাটা এগিয়ে ধরলেন শ্যামবাবু।

—অসুখই ঠিক মত ধরতে পারলাম না—ফি নেওয়াটা কি সমীচীন হবে? ওটা ওদের পথ্যের সঙ্গেই যোগ করে দেবেন, তাহলেই পরোক্ষে আমার নেওয়া হবে। আচ্ছা—!

—বসে বসে দিনরাত কি ভাবো বলতো? পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলে অদৃশ্য দেবু।

—বিরক্ত করো না। নিজের কাজে যাও। ঈষৎ বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললে ভানু।

অভিভাবকোচিত গাম্ভীর্য্যে অদৃশ্য দেবু বললে, দিনরাত শুধু প্রেমের ভাবনা ভাবলেই চলবে—না পড়াশোনা একটু আধটু করতে হবে!

—আবার বাজে বকে!

—বাজে বকি! হুঁ—! জানো—আমি তোমার গার্জেন!

হাসলে ভানু। বললে, গার্জেন এতক্ষণ ছিল কোথা?

—তোমারি কাছে!

অবাক হ'য়ে গেল ভানু। বললে, আমার কাছে! কাজটা কি শুনি?

—এখন অপ্রকাশ্য। পরে জানতে পারবে।

ক্ষণেক উভয়েই নীরব। নীরবতা ভঙ্গ করে ভানু বললে, আচ্ছা, দেবুদা!

—বল।

—আচ্ছা, কাঁইকুতু রোগে কি মানুষ মারা যায় ?

গম্ভীরভাবে দেবু বললে, বলা শক্ত। তবে যেতেও পারে।

—মারা যেতে পারে কাঁইকুতু রোগে ?

—তা পারে বইকি। ঝিনঝিনিয়ায় যখন লোক মারা যেতে শুনেছি তখন কাঁইকুতু রোগেই বা না মরবে কেন।

—তা বটে। বলে চুপ করে গেল ভানু।

—তা মনে মনে মতলব এঁটেছো ভাল। কাঁইকুতু রোগে সাবিত্রীদির মাসীমা মারা যাক আর তুমি বিনা বাধায় সাবিত্রীদিকে আমার বৌদি করে ফেল, বাঃ চমৎকার ! এই নইলে ফাষ্টবয়ের মাথা ! ব'লে হেসে উঠলো অদৃশ্য দেবু।

—না-না-না—কথাটা তুমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছো না। আমি বলছি—

—তুমি যা বলছো তা আমি বলবার আগেই বুঝেছি। তবে একথা নিশ্চিত জেনে রেখো—কাঁইকুতু রোগে মানুষ কোনদিন মরেনি আর মরবেও না কোনদিন !

হতাশার স্বর ফুটে উঠে ভানুর কণ্ঠে, তাহলে উপায় !

—নিরুপায় ! শোন দাদাবাবু, দিন দুয়েকের জন্যে আমার ছুটি। আমি একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি।

—সে কি ! আমার এই বিপদ—

—মাপ কর দাদাবাবু ! তোমার ঐ প্রেমের ব্যাপারে আমি নেই। চললাম।

বিরাট হলে মেডিক্যাল বোর্ড বসেছে। এসেছে সব বহুদর্শী, শতমারী, সহস্রমারী বিজ্ঞ ডাক্তার। চিকিৎসার খ্যাতি তাঁদের বাঙলা বনাম ভারত জোড়া। সব এক একটি জীবন্ত ধন্বন্তরী, যাকে বলে রোগের যম।

উঁচু প্লাটফর্মের ওপর বসেছেন আজকের সভার নির্ব্বাচিত সভাপতি। তাঁর পিছনে দেওয়ালের ঝুলন্ত বোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা ঃ—

আলোচ্য বিষয়—'কাঁইকুতু' !

সামনের চেয়ারে উপবিষ্ট বোর্ডের অন্যান্য মেম্বর। 'কাঁইকুতু'কে নিয়ে মেম্বরদের মুখে বক্তৃতার তুবড়ী ফুটলো, সভাগৃহে আলোচনার তুমুল ঝড়, শিলাবৃষ্টি হ'য়ে গেল। শিলাবৃষ্টির পর পৃথিবী শীতল হয়, সভাগৃহও শীতল হলো, অর্থাৎ একটা স্থির সিদ্ধান্তে ধন্বন্তরীবৃন্দ উপনীত হলেন।

সভাপতি মশায় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দীপ্ত কণ্ঠে বিজয়ী বীরের মত সভাপতি গম্ভীরকণ্ঠে ঘোষণা করলেন:—অদ্যকার সভায় সর্ববাদিসম্মতিক্রমে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, কাঁইকুতু ইজ নট এ ডিজিজ। এটা একটা কিছুই নয়—শুধুই কাঁইকুতু, মানুষের স্নায়বিক দুর্বলতা। মানসিক ব্যাধি থেকে এর উৎপত্তি। স্নান, আহারাদি—অর্থাৎ নাইতে খাইতেই ইহা সারিয়া যাইবে। অতএব ইহা যখন কোন রোগ বলিয়াই গণ্য হইল না তখন ইহার ঔষধও নাই। এঁ—ইয়ে—আহা-হা-হা—আরে—আচ্ছা মুস্কিল তো! শেষকালে আমাকেই—! বলতে বলতে কাঁইকুতুর অঙ্গভঙ্গি সহকারে তিনি নিজের আসনে বসে পড়লেন। বসে পড়েও কি নিস্তার আছে, কাঁইকুতুর জ্বালায় একবার চেয়ারের ডানদিকে—একবার বাঁ দিকে—একবার পিছনে—হেলে দুলে বেঁকে চুরে স্বয়ং সভাপতি মশায় বিব্রত হ'য়ে উঠলেন। অথচ কয়েক মুহূর্ত্ত আগে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে তিনিই ঘোষণা করেছেন—কাঁইকুতু একটা রোগই নয়।

—প্রেসিডেণ্ট যেন কেমন কেমন কচ্ছেন! হঠাৎ কি ওঁর শরীরটা অসুস্থ হ'য়ে উঠলো? বললে জনৈক ডাক্তার তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট বন্ধুকে।

—কি হলো বুঝতে পাচ্ছো না! ওঁকেও ধরলো।

জনৈক ভীতু ডাক্তার আতঙ্ক-মিশ্রিত কণ্ঠে বলিলেন, রোগটা ছোঁয়াচে নয় তো!

—এই তো সাব্যস্ত হ'য়ে গেল—এটা একটা রোগই নয়। রোগই যখন নয় তখন 'ছোঁয়াচে' কথাটাই তো এক্ষেত্রে অবান্তর। বেশ দর্পের সঙ্গেই বললেন প্রবীণ ডাক্তার।

দর্পহারী মধুসূদন নিজের দর্প রাখেন নি! কাজেই এই দাম্ভিক ডাক্তারের দর্প যে চূর্ণ হবে—এ আর এমন বিচিত্র কথা কি! কাঁইকুতু তাঁকেও রেহাই

দিলে না, ম্যাজিকের মত কাজ সুরু হ'য়ে গেল। ডাক্তার লম্ফ-ঝম্প সুরু করে দিলেন। পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বোধ হয় ছোঁয়াচ লাগার ভয়ে বা ডাক্তারের বিপুল দেহ ঘাড়ে এসে পরার ভয়ে আসন ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। কিন্তু উঠে পড়া অর্থে বেঁচে যাওয়া নয়। ছোঁয়াচে রোগের পরশ লাগতে দেরী হলো না। সংক্রামক ব্যাধির মত কাঁইকুতু সারা সভায় সংক্রমিত হ'য়ে গেল। কিন্তু মজা এই—একসঙ্গে সবাইকে এ রোগের ছোঁয়াচ লাগছে না, একজনকে ধরছে—আর একজনকে ছাড়ছে। এ আবার কেমন রোগ যে একসঙ্গে সবাইকে ধরতে পারে না।

রাজলক্ষ্মী দেবীকে যখন কাঁইকুতু ধরেছে তখন তাঁর কন্যা যমুনা দেবী সুস্থ, আবার যমুনা দেবীকে ধরলো তখন তাঁর মা রাজলক্ষ্মীর কোন ব্যাধির লক্ষণ নেই। একি প্রহেলিকা!

কিন্তু এ সব গবেষণার এখন সময় কোথা! 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' অবস্থা সভাস্থ সকলের।

কাঁইকুতুর প্রচণ্ড বিক্রমে দু'জন মহিলা ডাক্তারের শাড়ী সামলানো দায় হ'য়ে উঠলো। হাসি-কান্নার সংমিশ্রণে তাঁদের চোখের কোণ অশ্রুসজল হ'য়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি সভাগৃহ ত্যাগ করতে করতে তাঁরা ঘোষণা করলেন ক্রন্দন-মিশ্রিতকণ্ঠে, শীগ্‌গীর পালিয়ে চলুন—শীগ্‌গীর। এটা একটা বিষম ছোঁয়াচে রোগ!

রাজলক্ষ্মী দেবী খাটের উপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে আছেন কাঁইকুতু লাগার প্রতীক্ষায়। উদগ্রীব এবং উৎকণ্ঠায় মুখ তাঁর বিবর্ণ, ফ্যাকাসে।

খাটের পাশেই টিপয়ের ওপর নানাবিধ বলকারক খাদ্যসম্ভার পথ্য হিসাবে সাজানো। প্রাতঃকালীন জলযোগের যৎকিঞ্চিৎ নমুনা:—এক গ্লাস গরম দুধ, এক কাপ কোকো, চারটে মুরগীর ডিমের পোচ। একটা বড় ডিসে সাজানো—চারটে আপেলের কুঁচি, চারটা বড় মর্ত্তমান কলা, পুরু করে মাখন

লাগানো ছ'খানা টোষ্ট, পেস্তা-বাদাম, আর একটা ডিসে খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা দিস্তে খানেক লুচি আর পোয়াটাক আলু ভাজা।

শ্যামবাবু ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে শান্ত অবস্থায় দেখে বেশ খুসী মনেই জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ আজ?

—আপাততঃ ভালই তো মনে হচ্ছে।

গৃহিণীর পাশে খাটে এসে বসলেন শ্যামবাবু। বললেন স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে, একেবারে সেরেছে তো?

মুখখানা বিষণ্ণ করে রাজলক্ষ্মী বললেন, অত সারাসারি বুঝি না। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এখুনি হয়তো আবার তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠতে হবে।

—তাইতো—বড়ই ভাবনার কথা হলো। এ বয়সে—এ চেহারায় কাঁহাতক আর লাফালাফি করবে! ক্রমশঃই যে কাহিল হ'য়ে পড়ছো। বলতে বলতে শ্যামবাবুর দৃষ্টি পড়লো টিপয়ের ওপর। আঁতকে উঠে বললেন, সর্বনাশ! এখনো জল খাওনি! নাঃ কাহিল হ'তে যেটুকু বাকি ছিল তাও এবার পূর্ণ হবে তোমার হত-শ্রদ্ধায়। একটু সময় মত না খেলে এত লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি করে শরীর টিকবে কেন! নাও—নাও—খেয়ে নাও!

—দিনরাত শুয়ে শুয়ে খেয়ে গতর তো আরো বেড়েই যাচ্ছে কিন্তু লম্ফ-ঝম্প সারছে কই? তোমার ডাক্তার কি বলে? কি গো চুপ করে আছো যে?

—বলে—বলে বড় মারাত্মক কথা!

—কি কথা?

—সে বড় নোংরা কথা। তোমার শুনে কাজ নেই।

গর্জে উঠলেন রাজলক্ষ্মী, বললেন, তার মানে! আমার অসুখ আর আমি শুনতে পাবো না, এ সব তোমার কি অনাছিষ্টি কাণ্ড!

—বলতে অবশ্য আমার কিছু আপত্তি নেই তবে কথাটা একটু বিশ্রী কিনা তাই—

—হোক বিশ্রী—কথাটা আমি শুনবোই শুনবো। বল কি কথা?

একবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ঈষৎ চাপা গলায় শ্যামবাবু

বললেন, ডাক্তারের মতে—তোমাদের মা আর মেয়ের নার্ভগুলো চঞ্চল হ'য়ে ওঠার ফলেই ঐ কাঁইকুতু রোগের আক্রমণ।

—ভূ-ভারতে এত লোক থাকতে হঠাৎ আমাদের মা আর মেয়ের নার্ভগুলো চঞ্চল হ'য়ে উঠল কেন ?

—তার কারণ—ভূ-ভারতের সকলেই তো আর তোমাদের মত প্রেমে পড়েনি।

কর্পূরের মত জ্বলে উঠলেন রাজলক্ষ্মী দেবী। বললেন, তা প্রেমের সঙ্গে কাঁইকুতুর কি সম্বন্ধ ?

—প্রেমে পড়ার ফলে—প্রেমিকদের কথা ভাবতে ভাবতে তোমাদের দু'জনের নার্ভগুলো—

কথা আর শেষ করতে হলো না শ্যামবাবুকে। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন রাজলক্ষ্মী, আমি প্রেমে পড়েছি ? প্রেমে পড়ার বয়স আছে আমার ?

—বয়সে কি প্রেম করা আটকায় ! রসিকতা করলেন শ্যামবাবু।

—রাখো তোমার ওসব বিলিতি রসিকতা। তোমাদের ঐ ডাক্তারকে ধরে রাঁচি পাঠিয়ে দাও। এ্যাঁ—এ্যাই সেরেছে ! আবার ধরলো যে গো—! বলতে বলতে অতবড় আড়াইমুনি দেহটা নিয়ে তড়াঙ করে লাফিয়ে উঠলেন।

—এ্যাঁ, বল কি ! আবার সুরু হ'য়ে গেল। বলতে বলতে শ্যামবাবু খাটের কোণঠাসা হ'য়ে গেলেন। বলা তো যায় না, অসুখের ঘোরে যদি একবার ঐ বিরাট বপু নিয়ে দেবী এসে দেবতার ঘাড়ে পড়েন তা হলে শ্যামবাবু একবারে চিড়ে-চ্যাপটা হ'য়ে যাবেন, আর প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে স্ত্রীকে হতে হবে স্বামী-হন্ত্রী। মহাপাতক থেকে তিনিই স্ত্রীকে রক্ষা করলেন।

—বসে বসে দেখছো কি ! আমার যে প্রাণ যায় !

—কি করি বল ! আমার যে আর হাত-পা আসছে না ! নাঃ, কি মারাত্মক ব্যাধি এলো রে বাবা দেশে। এ যে দেখছি সব পাগল করে ছেড়ে দেবে ! বলতে বলতে শ্যামবাবু নিজেই যেন পাগল হ'য়ে উঠলেন।

—ওরে বাবা—এ্যাই মরেছে! নাঃ আর পাচ্ছিনে! ডাক্তার—শীগগীর ডাক্তার ডাকো। কাঁইকুতুর জ্বালায় রাজলক্ষ্মী দেবীর অবস্থা বড়ই করুণ হ'য়ে উঠলো।

—যাচ্ছি—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। আজ তোমার রোগের একটা হেস্তো-নেস্তো ক'রে তবে অন্য কথা! এঁ্যা—আরে আরে—এ—এ—এইরে! আ-গেল-যা! হেঃ-হেঃ-হেঃ—। কাঁইকুতু যে শেষকালে আমাকেও ধরলো গো! এ—হেঁ-হেঁ—! বলে স্ত্রীর ছোঁয়াচ এড়িয়ে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করলেন শ্যামবাবু।

—ও মা! তোমাকেও তা হলে ধরলো! রাজলক্ষ্মী দেবীর কণ্ঠস্বরটা যেন কেমন কেমন শোনালো—আনন্দ কি দুঃখ ঠিক বোঝা গেল না।

—ওরে বাপ্‌রে! বলতে বলতে পড়ি-কি-মরি হ'য়ে শ্যামবাবু ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

—ইনকেলাব—জিন্দাবাদ্। ভুলো মৎ—ভুলো মৎ। বলতে বলতে কড়ি নিজের খেয়ালে দোতলার কড়িডোর দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কে যেন তাকে পিছন থেকে কাঁইকুতু দিয়ে দিলে। হি-হি ক'রে উঠে কড়ি বললে, আরে আমারও যে কাঁইকুতু লাগছে। এঁ-হে-হে, ভারি মজা তো—, আরে আবার!

কড়ি ছুটতে ছুটতে যমুনার ঘরে গিয়ে হাজির হ'য়ে বললে, দিদি! দিদি! তোমার সঙ্গে আমিও এবার নাচবো, আমারও কাঁইকুতু লাগছে।

—কিন্তু আমার তো আর কাঁইকুতু লাগছে না। সহাস্যে বললে যমুনা।

—লাগবে লাগবে—আবার লাগবে। ব'লে কড়ি আবার একদিকে চলে গেল। বোধ হয় তার মায়ের কাছেই গেল—কাঁইকুতু লাগার সুসংবাদটা দিতে।

কড়িডোরে তমন কেউ কোথাও নেই, একেবারে নির্জ্জন। অদৃশ্য দেবুর স্বগতঃ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, যা জাল ফেলেছি—ছিঁড়ে বেরোনো বড় শক্ত! এইবার দেখি—সাবিত্রীদির সঙ্গে দাদাবাবুর বিয়েটা কে আটকায়।

অদৃশ্য দেবুর কথা সাবিত্রী আড়াল থেকে শুনে ফেললে। যেখান থেকে কথাটা ভেসে এলো সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে চাপাগলায় বললে, তাই নাকি!

—কে? ওঃ! যাঃ আগেই শুনে ফেললে তো? কিন্তু খুব হুঁসিয়ার দিদি! আমার চক্রান্ত—, বলেই দেবু নিজেকে সামলে নিলে।

—তোমার এই কীর্ত্তি, দেবুদা!

—কীর্ত্তি! কীর্ত্তিটা কি দেখলে?

—আমি বুঝি কিছু বুঝি না? তোমার ঐ কাঁইকুতু, অর্থাৎ চক্রান্ত!

—তা হলে একান্তই ধরে ফেললে! খবরদার—আর কেউ না জানে। কথাটা বেফাঁস হ'লে ফ্যাঁসাদের আর অন্ত থাকবে না, দিদি। আচ্ছা, চলি। অদৃশ্য দেবুর কথা মিলিয়ে গেল বাতাসে।

বিপুল উল্লাসে সাবিত্রীর সারা অঙ্গে জাগলো বিদ্যুৎ-শিহরণ।

সেদিন অপরাহ্ণে ভানুর ঘরে আড্ডা বসেছে। আলোচ্য বিষয়—কাঁইকুতু। মেডিক্যাল বোর্ডের মিটিঙর কথা খবরের কাগজে পর্য্যন্ত উঠে গেছে। একি মারাত্মক ব্যাধি—যার তত্ত্ব আবিষ্কারে আধুনিক যুগের চিকিৎসকবৃন্দও হার মানতে বসেছেন!

জহর বললে, না—না—ঠাট্টা-তামাসা নয়। মেডিক্যাল বোর্ড পর্য্যন্ত কাঁইকুতু রোগের কোন হদিস বার করতে পারলে না।

—এই কাঁইকুতু হচ্ছে একটা সাঙ্ঘাতিক সংক্রামক ব্যাধি। সেদিন মিটিঙএ ডাক্তারদেরও ধরেছে।

পশুপতি ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বললে, আবার কবে বলতে কবে আ—আ—আমাদেরও না ধরে!

শ্রান্ত চরণে ক্লান্ত দেহে সমীরকে প্রবেশ করতে দেখে অজিত রহস্য করে বললে, হ্যালো মিষ্টার রোমিও! হোয়াটস্ এ্যাবাউট ইয়োর জুলিয়েট?

—দেয়ার আর গুড মেনি জুলিয়েটস্ লয়টারিঙ অন দি ষ্ট্রীট, বাট নন্ ইজ মাইন—ব্যাড লাক্! কেন! নিউ রোমিও মিষ্টার ভানু? তোমার সাবিত্রীর খবর কি? জিজ্ঞাসা করলে সমীর।

ভানু চিন্তিত কণ্ঠে বললে, আমি ভাবছি- ওদের ঐ একই বাড়ীর মধ্যে— ছোঁয়াছুঁয়ি হলে যদি সাবিত্রীকেও শেষকালে কাঁইকুতু রোগে ধরে।

—না—ধরবে না। কণ্ঠস্বর অদৃশ্য দেবুর।

—কে—কে বললে কথাটা ?

—কে বললে ?

—তুই বললি ?

—মা—মা—মাইরি আমি বলিনি।

—তাহলে সমীরদা বলেছে।

—নিশ্চয়ই না। আমি আমার ভাবী প্রেমিকার কথা ভাবছি। বলে প্রতিবাদ জানালে সমীর।

—কি ব্যাপার, ভানুবাবু ?

—কিছুই তো বুঝলাম না। সত্যিই কিছু না বোঝার ভাণে বললে ভানু।

—আচ্ছা তাজ্জব ব্যাপার তো !

—নি—নি নিশ্চয়—বোধ হয় আমাদের মধ্যে কে—কে—কে—কেউ বলেছে, মন্তব্য করলে পশুপতি।

মীমাংসা কিছু হলো না। সব যেন কেমন এলো-মেলো হয়ে গেল। আসর আর জমলো না। জমাটি আসর সামান্য একটা কথায় ভেঙে গেল। সবার ধারণা যে আমাদেরই মধ্যে কেউ-না-কেউ বলেছে, কিন্তু স্বীকার কেউ পাচ্ছে না। স্বীকার করলে মাথা-কাটা যাবে বা ফাঁসীর হুকুম হবে—এমন তো নয়, তবে এ রণের লুকোচুরি নিজেদের মধ্যে কেন ?

বঁধুয়া এসে ইতিমধ্যে বার কয়েক তাগাদা দিয়ে গেছে—খেতে যাবার জন্য। তক্ষণ খেয়ালই হয়নি। ভাঙা আসরে বঁধুয়া এসে আবার তাগাদা দিলে। এবার আর বঁধুয়াকে তাড়া না দিয়ে নিজেরাই তাড়াতাড়ি খেতে চলে গেল। একটু পরে খাবার দোহাই দিয়ে ভানু একাই রইলো ঘরে। আজ সে একটা শক্ত রকমের বোঝাপড়া করে ছাড়বে তার দেবুদার সঙ্গে। হাজার দিন সে দেবুদাকে

হুঁশিয়ার করিয়ে দিয়েছে—নিজে নিজেকে ধরা দিও না আর আমাকেও বেকায়দায় ফেলো না! তবু তার হুস্ হলো না!

নিস্তব্ধ ঘরে দেবুর চাপা হাসি শোনা গেল।

—দেবুদা!

—বল।

—তোমার আক্কেলটা কি?

—কি বে-আক্কেলের কাজটা তুমি আমায় করতে দেখলে, দাদাবাবু?

—আমাকে এ ভাবে অপ্রস্তুতে ফেলে—তুমি সবার কাছে নিজেকে ধরা দচ্ছো কেন?

হাসলে দেবু। বললে, তুমি পাগল হ'য়েছো! ঐ চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলো ধরবে আমায়! আমাকে বোঝা কি এতই সোজা? মামাবাবুর কথা ভুলে যাচ্ছো! তিনি কি এতই খেলো বৈজ্ঞানিক? বড় জোর—ব্যাপারটাকে ওরা ভৌতিক ভেবে হুটোপাটি করবে, ভয়ে মূর্চ্ছা যাবে, বেশী বাড়াবাড়ি দেখলে—হয়তো সব হোষ্টেল ছেড়ে পালিয়ে যাবে; তবু বিজ্ঞানের দিক থেকে কোন কিছু ভেবে দেখবার ক্ষমতা ওদের ঐ গোবরভরা মগজে নেই। তবে তোমার ভয় নেই, বেশী বাড়াবাড়ি আমি করবো না। আজ আর থাকতে না পেরে ওদের সঙ্গে একটু রসিকতা করলুম।

—বাঃ চমৎকার! তুমি করলে রসিকতা আর ঠেলা সামলাতে আমার হলো মাথা-ব্যথা।

—সাবিত্রীদির সঙ্গে মালা বদল না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার মাথা ব্যথা তো কমবে না, দাদাবাবু! কি—চুপ-চাপ যে

—জানি না!

—অভিমান করে থেকো না, দাদাবাবু—ঠকবে!

—বল না—কি করতে হবে?

হাসলে দেবু। বললে, শোন—আমি তোমাকে এমন একটা মাদুলি দিতে পারি যা যে কোন লোক পরলে তার কাঁইকুতু সেরে যাবে।

—বিশ্বাস কি!

—পরখ করে দ্যাখো।

—পরখ! কিন্তু কার ওপর পরখ করবো? আর পরখ করেই বা আমার লাভ কি!

হেসে ফেললে দেবু। বললে, বইপড়া বিদ্যে জাহির করে শুধু ফাষ্টই হ'য়ে এসেছো, সাধারণ বুদ্ধিটুকুও তোমার নেই। মাদুলিটাই হচ্ছে সাবিত্রীদিকে লাভ করার একমাত্র বিশল্যকরণী। ওটা তোমার বন্ধুদের হাতে দিয়ে তার মাসীমার কাছে পাঠিয়ে দাও, সর্ত্ত হচ্ছে—যদি সারে কাঁইকুতু তোমার দেওয়া ঐ মাদুলি পরে তা'হলে সাবিত্রীদির সঙ্গে তিনি বিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন, আর যদি না সারে তা'হলে তো কথাই নেই।

—মাদুলিটা কোথা পেলে?

—তা জেনে তোমার লাভ?

—বেশ, মাদুলিটা তাহলে দাও।

—ওটা রেখেছি তোমার সার্টের বুক পকেটে।

সানন্দে ভানু বললে, দেবুদা! দেবুদা! আর জন্মে তুমি আমার মার পেটের ভাই ছিলে!

—ভুলে যাচ্ছো কেন দাদাবাবু, এখনো ঐ মাদুলিটা তোমার পরখ করা হয়নি। আনন্দে অতটা উতলা না হ'য়ে একটু সামলে। রাত হ'য়েছে—যাও, খেতে যাও! ব'লে হাসতে হাসতে অদৃশ্য দেবু চলে গেল।

পরের দিন সকালে দেখা গেল—রাজলক্ষ্মী দেবীর কক্ষে জমায়েত হ'য়েছে অরুণ, জহর, অজিত, সমীর, পশুপতি প্রভৃতি। ভানুও ওদের সঙ্গ ছাড়েনি।

কাঁইকুতুর জ্বালায় আজ সকাল থেকেই তিনি কাবু হ'য়ে পড়েছেন, তার ওপর এই উট্‌কো ঝামেলা। এদের উপস্থিতি তিনি মোটেই সুনজরে দেখলেন না। মুখের ওপর তিনি বলেই দিলেন, আবার কেন তোমরা জ্বালাতে এসেছো, বাপু!

—জ্বালাতে আসিনি মাসীমা, আপনাকে আমরা দেখতে এসেছি।

—তোমরা দেখতে এলে অসুখটা যদি আমার সারে তাহলে তোমাদের দেখতে আমার মন হয়, নইলে শুধু শুধু আমার অস্থির প্রাণটাকে আরো বেশী অস্থির করে তুলে তোমাদের লাভ কি?

—আপনাকে মাসীমা বলি—মাও যা আর মাসীমাও তাই। আপনার সঙ্গে তো আর ঠাট্টা তামাসা করতে পারি না। আপনি যদি আমাদের কথা শোনেন—

অরুণকে কথা শেষ করতে না দিয়ে প্রায় ঝঙ্কৃত কণ্ঠে রাজলক্ষ্মী বললেন, তোমাদের বাপু ও সব কলেজী ভনিতা রাখো, কি কথাটা তোমাদের শুনতে হবে শুনি?

—বিশ্বাস করুন, আমরা আপনার রোগ সারিয়ে দিতে পারি।

—ওঃ! বলে—কত গেল রথারথী আর ঘ্যাওড়া তলায় চক্রবর্ত্তী। কত ডাক্তার বদ্যি হার মেনে গেলো আর তোমরা এসেছো ধন্বন্তরী হ'য়ে। সাহসকে তোমাদের বলিহারী যাই। কথায় বলে, হাতী ঘোড়া গেল তল আর মশা বলে কত জল!

—আহা—হা, অন্য চিকিৎসা নয়, শুধু একটা ছোট্ট মাদুলি যদি আপনি পরেন তাহলে আপনার রোগ সেরে যাবে।

—মাদুলী! রাজলক্ষ্মী দেবীর স্বর নিম্নস্তরে নেমে এলো।

—হ্যাঁ, ভানুবাবুর স্বপ্নাদ্য দেবতার মাদুলী। কি বলবো মাসীমা—ডাকলে সাড়া দেয়, বলি—, ডাক্তার বদ্যি তো হার মানলো—এটাও নয় একবার পরীক্ষা করে দেখলেন।

দেবতার দেওয়া মাদুলী! হিন্দু ঘরের নারী হ'য়ে উপেক্ষা করেন কেমন করে! রাজলক্ষ্মী দেবীর মনটা নরম হলো! ঠাকুর দেবতার ওপর দুর্ব্বলতা নেই —এমন হিন্দু নারী আজও বিরল। বলা তো যায় না, স্বপ্নাদ্য—ঠাকুর-দেবতার মাদুলি ধারণ করে বহু কঠিন ব্যাধির হাত থেকে রেহাই পেতে বহু লোককেই তিনি শুনেছেন। হাজার হাজার টাকা খরচ করেও যে রোগ সারানো যায়নি—সামান্য

একটা তামার মাদুলীতে সেই রোগ চিরদিনের মত সেরে গেছে। অবিশ্বাস করার কিছু নেই। কিন্তু তাঁর কি এমন সৌভাগ্য হবে!

—ঠিক সারবে তো? অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন রাজলক্ষ্মী।

—যদি না সারে তা'হলে ভানুবাবুর সঙ্গে সাবিত্রী দেবীর বিয়ে দেবেন না।

—ওঃ, তা'হলে এই সর্ত্তে তোমরা আমাকে মাদুলী দিতে এসেছো! এতোটুকু ছেলে হলে সব কি হবে—পেটে পেটে তোমাদের হীরের ছুরি লুকানো আছে! ওরে বাবা রে—এইতো এতক্ষণ বেশ ছিলুম গো—এ্যাঃ—এ্যাই মেরেছে। ওরে ও যমুনা! এ্যাইরে—গেছি—! রাজলক্ষ্মী দেবী—কাঁইকুতুর জ্বালায় চোখে সরষে ফুল দেখলেন, বিয়ে দিতে গররাজি হবার সন্ধিক্ষণে কাঁইকুতু আবির্ভাব। বিয়ে না দিলে কি অবস্থা তার হবে—এটাই যেন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে ঐ কাঁইকুতু। অপেক্ষাকৃত সুস্থ হ'লে অরুণ বললে, আমরা তাহলে উঠি, মাসীমা!

—ঐ সর্ত্তে যদি রাজি না হই তাহলে মাদুলীটা তোমরা আমরা দেবে না?

—সে কি কথা, মাসীমা! মাদুলীটা তো আপনাকে আমরা দেবার জন্যেই এনেছি। তবে কিনা—

—তবে কিনা—মাসীমাই বলি আর যাই বলি—সর্ত্তটা কিন্তু বজায় রাখা চাই! বলিহারী আজকালের ছেলেদের বাবা!

হেসে ফেললে জহর। বললে, তাহলে—তাহলে আপনি রাজি তো?

—রাজি না হ'য়ে আর অন্য উপায় আছে! কাঁইকুতুর জ্বালায় প্রাণ যে আমার অতিষ্ঠ!

অজিত বললে একান্ত নির্লজ্জের মত, তবু আপনার মুখের কথাটা আমরা একবার শুনে যেতে চাই!

—বেশ বাপু! কথা দিচ্ছি—ভানুর দেওয়া দৈব-মাদুলীতে যদি আমার কাঁইকুতু রোগ চিরদিনের মত সেরে যায় তাহলে—! ব'লে রাজলক্ষ্মী থেমে গেলেন। বোধ হয় মনে পড়লো যে, কি মারাত্মক কথাই না তিনি উচ্চারণ করতে যাচ্ছেন! কত আশা করেছিলেন যে যমুনার সঙ্গে তিনি ভানুর বিয়ে দেবেন। কিন্তু এ হতে যাচ্ছে তাঁর ইচ্ছার বিপরীত। 'হাকিম নড়বে তবু

হুকুম নড়বে না!' কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে আজ 'হাকিম নড়লো না—হুকুমই নড়ে গেল!' কি কাল রোগেই না তাঁকে ধরলো।

—বলে ফেলুন—বলে ফেলুন! রাজলক্ষ্মী দেবীর মুখ থেকে কথা বার করার জন্য তাড়া দিলে অজিত।

রাজলক্ষ্মী তার দিকে কট্-মট্ করে একবার চাইলেন। শত্তুর—শত্তুর, সব! ভগবানের দেওয়া বিশেষ ক্ষমতার অধিকারিণী হলে তিনি এই মুহূর্তে এই শত্রুদের ভস্ম ক'রে দিতেন—চোখের পলকে।

রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়ে নেবার জন্যই যেন কাঁইকুতু আবার সুরু হ'য়ে গেল। প্রমাদ গণলেন রাজলক্ষ্মী।

একটু সুস্থ হ'য়ে তিনি নিজেই বললেন, রোগ সারলে ভানুর সঙ্গে সাবিত্রীর আমি বিয়ে দেবো—দেবো—দেবো। এই তিন সত্যি করলুম।

ভানু তাড়াতাড়ি উঠে রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধুলো নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—হাতটা এগিয়ে দিন তো মাসীমা! বললে অরুণ।

মাসীমা হাতটা এগিয়ে দিলেন। অরুণ উঠে এসে রাজলক্ষ্মী দেবীর হাতে মাতুলীটা সযত্নে বেঁধে দিলে।

—আজ তাহলে আমরা আসি, মাসীমা?

—তাকি হয়, বাবা? কখন এসেছো সব—একটু চা-টা না খাইয়ে কি ছেড়ে দিতে পারি! ওরে—ও যমুনা! তোর দাদাদের চায়ের ব্যবস্থা কর তাড়াতাড়ি!

—তোমার বলবার আগেই সাবিদি চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে। আমি যাচ্ছি নিম্‌কি ভাজতে!

—দেখছিস্ না—চা না খেয়ে বাছাদের সব মুখ শুকিয়ে একবারে আম্‌সী হ'য়ে গেছে। তাড়াতাড়ি যা মা।

—মুখ শুকোবার আর অপরাধ কি বল। কখন থেকে তীর্থের কাকের মত সব বসে আছেন, তায় আছে গলাবাজি! ব'লে চাপল্যের হাসি হাসতে হাসতে যমুনা চলে গেল।

চা খেয়ে ওরা মাসীমার কাছে বিদায় নিলে যাবার সময়। মাসীমা সস্নেহে বললেন, আবার এসো, বাবা।

—নিশ্চয় আসবো। তবে এবার আসবো বিয়ের বরযাত্রী হ'য়ে। বলে ওরাও হাসলে, মাসীমাও হাসলেন।

সিঁড়ি দিয়ে সবাই কলরব করতে করতে নীচে নামছে। দলের পিছনে পড়েছে ভানু। পিছন থেকে চাপা গলায় সাবিত্রী ডাকলে, ভানুদা!

—আমায় ডাকছো ?

—হ্যাঁ। এদিকে এসো! ভানুকে নিয়ে সাবিত্রী করিডোরের শেষ প্রান্তে চলে গেল। স্থানটা অপেক্ষাকৃত নির্জন।

—ওরা এখুনি ডাকাডাকি করবে। বল—কি বলছিলে ?

—বলছি—মাদুলীটা কোথায় পেলেন? স্মিত হাস্যে জিজ্ঞাসা করলে সাবিত্রী।

নীচে থেকে অরুণের গলা শোনা গেল, ভানুবাবু আবার কোথা কেটে পড়লেন ?

—এক মিনিট! যাচ্ছি। ওপর থেকে বললে ভানু।

—কে দিয়েছে ঐ মাদুলী ?

—এক সাধুবাবা!

—আপনার সাধুবাবাটিকে আমি চিনি।

—তার মানে!

—সাধুবাবাটি হচ্ছেন স্বয়ং দেবুদা।

ভানু বিস্ময়ভরা নেত্রে চেয়ে রইলো সাবিত্রীর মুখের দিকে। গত কাল রাত্রে যে ব্যাপার ঘটেছে—সে খবর সাবিত্রী জানলে কেমন করে! দেবুদার দেওয়া মাদুলীর খবর করো কাছেই তো সে প্রকাশ করেনি।

—অমন ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছেন! আপনার আগেই আমি দেবুদাকে ধরে ফেলেছি।

—ধরে ফেলেছো!

—হ্যাঁ! কাঁইকুতু রোগটা যে দেবুদারই সৃষ্টি। সারা দেশটাকে দেবুদাই তো কাঁইকুতুর জ্বালায় মাতিয়ে তুলেছে।

—বটে! তাই দেবুদা আজকাল যখন-তখন হোস্টেল থেকে হাওয়া হ'য়ে যাচ্ছে। ওঃ কি তাজ্জব ব্যাপার। দেবুদার সাধারণ বুদ্ধির কাছে আমরা একবারে 'নো-হয়ার!' উঃ, তোমার আমার জন্যে কি বিশ্রী চক্রান্তই না ফেঁদেছে দেবুদা!

—বিয়ের ঘটকদের সোজা পথে সব সময় চলতে নেই।

সাবিত্রীর হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে ভানু প্রেমবিহ্বল নেত্রে বললে, বিয়েটা তাহলে আমাদের নির্ঘাত লাগলো!

—বলা কিছুই যায় না! ব'লে দুষ্টুমির হাসি হাসলে সাবিত্রী।

—এখনও সন্দেহ!

—নিশ্চয়! দেয়ার আর গুড মেনি স্লিপস্ বিটুইন দি কাপ্ এণ্ড দি লিপস্!

—তবে রে দুষ্টু! ব'লেই ভানু সাবিত্রীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মুখের কাছে মুখটা নিয়ে গেল।

—রবারের মিনিট কি শেষ হবে না, ভানুবাবু! আরো কতক্ষণ! অরুণের শ্লেষাত্মক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো নীচ থেকে।

—এই যে—যাই। বলতে বলতে ভানু নীচে নেমে গেল।

বছর দেড়েক পরে গল্পের যবনিকা উঠলো ভানুর বাসাবাড়ীর খাবার ঘরের টেবিলে। সাবিত্রীর সঙ্গে শ্রীমান ভানুর শুধু বিয়েই হয়নি—আজ তারা একটি পুত্র সন্তানের জনক-জননী।

পুত্রের অন্ন-প্রাশনে ভানু আজ তার কলেজী বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করেছে। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দ সকলেই পুরাতন এবং পরিচিত যথা—অরুণ, জহর, অজিত, পাপু, অনুপ, সমীর, পশুপতি আর মেয়েদের মধ্যে যমুনা ও কলেজীয় অন্যান্য বান্ধবী।

বলা বাহুল্য—ভানুর সঙ্গে সাবিত্রীর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেবার পর থেকে রাজলক্ষ্মীর কাঁইকুতু সেরে গেছে কিন্তু বর্ত্তমানে বাত-ব্যাধিতে তিনি বড়ই কা পাচ্ছেন। বাতের মাদুলী যোগাড় করে দেবার জন্য ভানুকে তিনি সকাত অনুরোধ জানিয়েছিলেন—ভানু তাঁর অনুরোধে সাড়াও দিয়েছিল, কিন্তু দুঃখে কথা—তার দেওয়া মাদুলীতে কাঁইকুতুর মত বাতব্যাধি সারলো না। এ বারে মাদুলীটা একদম বাজে।

সাবিত্রীর পুত্রের অন্নপ্রাশনে আসার তাঁর খুবই ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাত আর বি উভয়েই তাঁর উপর বাম, তাই ইচ্ছা সত্বেও আসতে তিনি অপারগ।

আর একটা শুভ খবর হচ্ছে—জহর বর্ত্তমানে রাজলক্ষ্মী দেবীর ভাবী জামাতা। বিয়ের কথাটা পাকাপাকি হয়ে গেছে, শীগ্‌গীর চার হাত এক হ'য়ে যাবে আগামী এক শুভ লগ্নে। কারণ আর কিছুই নয়, ভানু যখন হাতছাড়া হয়েই গেল, তখন যমুনা-তরণীর জন্য আজীবনের আশ্রয় হিসেবে একটা পোর্ট তো চাই! জহরকেই তিনি সেই পোর্ট সাব্যস্ত করলেন। ফার্ষ্ট বয় নাই হোক—জমিদারের ছেলে তো বটে!

ভানুদা যখন সম্পর্কের দিক দিয়ে ভানু-দাদাবাবু হয়ে গেল, তখন যমুনা জহরকেই সমর্থন করে নিলে। জহর যে তাকে ভালবাসে—এ কথা যমুনা মনে প্রাণে জানে। ভানুদার আশায় সে-ই এতদিন তাকে আমল দেয়নি। পোর্ট হিসেবে ভানুদা ভাল, কিন্তু জহরও খারাপ নয়।

আগন্তুকদের পরিবেশন করলে যমুনা আর সাবিত্রী। ভানু বাড়ীর কর্ত্তা হিসেবে করলে তদারক। বন্ধুরা ছাড়লে না—তাকেও তাদের সঙ্গে টেবিলে খেতে বসতে হলো। ভানুকে যখন বসতেই হলো তখন সেও বাদ দিলেনা যমুনাকে। যমুনার সঙ্গে এখন তার মধুর সম্পর্ক। শালিকার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে ভানু তাকে নিজের পাশে বসালে।

খেতে কিছুতে চায় না যমুনা। ভানু জোর করে তার মুখে এক টুকরো মাংস পুরে দিয়ে বললে, কি বলবো—জহরের সঙ্গে যে নেহাত তোমার বিয়ের কথাটা

পাকাপাকি হয়ে গেছে, নইলে আমি তোমাকে তোমার বোনের সতীন করে ছেড়ে দিতুম।

মুখফোঁড় অজিত ছড়া কাটতে চিরদিনই ওস্তাদ। সে বলে উঠলো :—

নিম তিতো, নিচ্ছিন্দে তিতো
আর তিতো মাকাল ফল।
আর তার চাইতে তিতো দাদা—
বোন সতীনের ঘর!

—সাবধান যমুনা দেবী! অমন কাজটি করবেন না।

সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো।

—আপনাদের যার যা দরকার চেয়ে চিন্তে নেবেন, কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। বুঝতেই পাচ্ছেন—বাড়ীর কর্ত্তা এবং গৃহিনী দু'জনেই নাবালিকা। কাজেই অভিভাবকের গুরুভার আমাকেই বহন করতে হচ্ছে! কি বলেন—প্রধান অতিথি জহরবাবু? বললে সমীর।

সমীরের কথা শুনে মুখ টিপে হাসলে যমুনা আর বান্ধবীর দল।

জহর বললে, দেড় বছর আগে খেয়েছি ভানুবাবুর বিয়েতে—

—আজ দেড় বছর পরে খাচ্ছি ভানুবাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশনে। কাজেই চেয়ে চিন্তে খেতে হবে বইকি! কারণ আপাততঃ—

—আর কোন স—স—সম্ভবনা নেই।

অরুণ বললে, নিশ্চয় আছে। যমুনা দেবীর বিয়ে!

রহস্যঘন কণ্ঠে জহর বললে, বার বার বিয়ের কথা বললে আমার কিন্তু ভাই লজ্জা করবে!

—আপনি তাহলে ঘোমটা দিয়ে বসুন!

—আমি কিন্তু এবার সত্যি-সত্যি উঠে যাবো, ভানুদা! লাজনম্র কণ্ঠে বললে যমুনা।

—বটে—উঠে অমনি গেলেই হলো! আজ না হয় উঠে গেলে কিন্তু পনেরই ফাল্গুনের গোধূলি লগ্ন! সেদিনের আলপনা দেওয়া পিঁড়ের ওপর বসবার জন্যে

যে হা-পিত্যেশ করে উদগ্রীব হ'য়ে বসে আছো। বলি—সেদিন কোথায় থাকবে তোমার লজ্জা ?

অজিত বললে, তারপর আছে বাসর-ঘর !

—আবার সবাই মিলে ওর পিছনে লেগেছেন তো! ছেলে কোলে নিয়ে বলতে বলতে এসে ঢুকলো সাবিত্রী।

—ওঃ এক ছেলের মা হ'য়ে খুব যে গিন্নী হ'য়েছো দেখছি! সাবিত্রীর উদ্দেশে বললে ভানু।

—থামো তুমি! কৃত্রিম ঝঙ্কার দিয়ে বললে সাবিত্রী।

—আচ্ছা—এ সময় আপনি আবার এখানে কেন এলেন বলুন দেখি! বললে অরুণ।

—সবাই মিলে ওকে ক্ষেপাবার খুব সুবিধা হয়—না? এ সব জেনেই—এক সঙ্গে খেতে বসতে আগেই আমি যমুনাকে বারণ করেছিলুম।

—আমি কি করবো? ভানুদাই তো ধরে কর্ম্ম ঘটালে!

নিতান্ত গোবেচারীর মত ভানু বললে, সত্যি-মিথ্যে তোমরাই বিচার কর ভাই। আমি আর এঁটো মুখে কি বলবো! আমার সঙ্গে খাবার ওর বহুদিনের আশা—

—ভাল হচ্ছে না কিন্তু ভানুদা! বলে সাবিত্রীর দিকে চাইলে যমুনা।

জহর বললে, ও বৌদি! আর একটা রাজভোগ!

—বৌদির এখন ছেলে কোলে। যেটুকু খালি রইলো সেটুকু তোর বিয়ের দিন ভরিয়ে নিস! বললে অরুণ।

—খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু অরুণবাবু! অরুণের দিকে আড় চোখে চেয়ে বললে যমুনা।

—আঃ চটছিস কেন যমুনা। তোর জ্বালায় কি জহরবাবু পেট পুরে খাবেন না!

—বাঃ রে আমি কি বারণ করেছি, নাকি!

—তা একরকম কচ্ছো বইকি। বেশী খেলে শরীর খারাপ হবার ভয়টা

আপাতত: জহরবাবুর চেয়ে তোমার দেখছি বেশী। কোন চিন্তা নেই—মা ভৈঃ। পনেরই ফাল্গুন চার হাত তোমাদের—

—আবার!

—এদের নিয়ে কি করা যায় বলুন তো, অরুণদা! সহাস্য কণ্ঠে বললে সাবিত্রী।

—যমুনা দেবীর পাতে গোটা দুই আর জহরের পাতে গোটা পাঁচেক রাজভোগ দিয়ে ওদের দু'জনের মুখ একবারে বন্ধ করে দিন।

—আমি কি রাজভোগ চেয়েছি নাকি?

—ধরতো, দেবুদা!

—হাত পেতেই আছি। বললে অদৃশ্য দেবু।

শূন্যের ওপর ছেলেটাকে দিয়ে সাবিত্রী তাড়াতাড়ি রাজভোগ আনতে চলে গেল। ছেলেটা শূন্যে দোল খেতে লাগলো—বিস্ময়ের অন্ত নেই। এ কি স্বপ্ন—না সত্য! কেউ আসন ছেড়ে বিস্ফারিত নেত্রে উঠে দাঁড়াল—কেউ গালে এক কামড় রাজভোগ পুরে চিবোতে ভুলে গেল—কাউর হাতের মাংসের টুকরো হাতেই রয়ে গেল, মুখে আর উঠলো না। কেউ বসে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো।

—এ্যাঁ! সমীর ফিট হ'য়ে চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

—দিন দুপুরে একি ভৌতিক কাণ্ড! চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে দিলে জহর জলের গ্লাস ফেলে টেবিলে বান ডাকিয়ে।

—ও ভা—ভা—ভা—ভানু! পশুপতি পালাতে গিয়ে চিৎপাৎ হ'য়ে পড়ে গেল।

—ভয় নেই—বসো সব—কোন ভয় নেই। যে দোলাচ্ছে ও ভূত নয়—মানুষ! বিব্রত হ'য়ে পড়লো ভানু।

কে কার কথা শোনে। আধুনিক যুগের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। সারাঘরে একটা লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড ঘটে গেল। কেউ গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে—কেউ মাটিতে পড়ে আছে—কেউ ঘরের কোণ আশ্রয় করেছে—আবার কেউ বা চেয়ারে কাষ্ঠ হ'য়ে বসে আছে।

রাজভোগের থালা নিয়ে সাবিত্রী ঘরে ঢুকলো।

—কি কাণ্ড করলে বলতো। বললে ভানু।

—আমার কিন্তু আজ আর কোন দোষ নেই, দাদাবাবু। হাস্যমুখর কণ্ঠে বললে অদৃশ্য দেবু।

—তাই তো! বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে। আমার মোটে খেয়ালই ছিল না। ওকি—! বলে সাবিত্রী অবাক হ'য়ে গেল।

এক লহমায় দেবুর রক্ত-মাংসের দেহ সবার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। বাস্তব জগতে ফিরে এলো দেবু—ফিরে এলো নিমন্ত্রিত বন্ধুমণ্ডলী!

—দেবুদা! ভানুর আনন্দ মাত্র ঐ একটি ডাকের মধ্য দিয়ে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো।

—হ্যাঁ—আমি! ধরতো বৌ'দি একবার খোকাকে! ব'লে দেবু দু'হাত তার সারা অঙ্গে বুলিয়ে নিয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে সোল্লাসে বললে, এতদিন পরে আমি আবার আমার রক্ত-মাংসের দেহ ফিরে পেয়েছি। ওষুধের ঘোর আমার সত্যি সত্যি এতোদিনে কাটলো। আঃ বাঁচলাম! নমস্কার দাদাবাবু! নমস্কার বৌদি আর জয়হিন্দ জানাই আপনাদের সকলকে!

-শেষ-